ভারতের দাবী

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স্‌
১০।৭।এ, হ্যারিসন্‌ রোড, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, বি-এ
শ্রীবারিদকান্তি বসু

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৩২

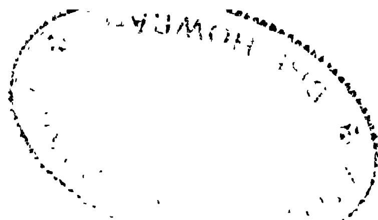
দাম বার আনা

কলিকাতা ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

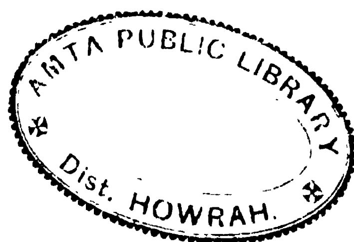
ভারতের দাবীকে অপ্রতিহত করিতে
যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,
করিবেন, সেই সব আগত,
অনাগত, ভারত-ধর্ম্মীদের
উদ্দেশে উৎসৃষ্ট
হইল।

১লা আশ্বিন, ১৩৩২
কলিকাতা।

গ্রন্থকার



সূচীপত্র



ভারতের দাবী

• কথাটা স্বীকার করিতে লজ্জায় মাথা যতই নুইয়া পড়ুক, কথাটা স্বীকার করিয়া নেওয়া ছাড়াও আজ আর গত্যন্তর নাই যে, পরবশতার মোহ আজিও আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

স্বাধীনতা আমরা হারাইয়াছি, সে স্থলে পাইয়াছি পর-বশ্যতার বন্ধন। আমাদের চরম দুর্গতির কথা কিন্তু ইহাই নহে, চরম দুর্গতির কথা ইহাই যে, আমরা এই বন্ধনের মধ্যে সোয়াস্তির সন্ধান পাইয়াছি। দাসত্ব এই জন্যই জঘন্য যে দাসত্বের মধ্যে যে দায়িত্বহীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা আছে, সেখানেও দাস একটু আরামের সন্ধান পায়,—সেই আরামের মোহ কাটাইয়া উঠিতে সে ব্যগ্র নহে।

জাতীয় পরবশতার মধ্যেও তেমনি জাতি একটা দায়িত্বহীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের খোঁজ পাইয়া সেই পরবশ্যতার হীন আরামটুকুকে আঁকড়াইয়া থাকে, সেই আরামের গোলাপী নেশায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেইখানেই সোয়াস্তির সন্ধান করে। সেই আরামের নেশাই তাহাকে মানুষ হইতে, পরবশ্যতার অষ্ট-নাগ-পাশ-মুক্ত স্বাধীন সজীব মানুষ হইতে বাধা দেয়। তাই ত আমাদের দেশের হাজার-করা নয়শ নিরানব্বই জন মানুষের কাছেই পরাধীনতার বেদনা আজিও তীব্রতর—অসহ্য হইয়া উঠে নাই। পরবশ্যতার আরাম ছাড়িয়া আমাদের দেশের লোক তাই মুক্তির বাস্তব ক্ষেত্রে নামিতে এবং সেই ক্ষেত্রে নামিয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতে আজিও ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই। ব্যস্ত নহে বলিয়াই আমাদের মুক্তির দাবী আজিও অমোঘ—অপ্রতিহত হইতে পারিল না।

তবু কিন্তু মুক্তির স্মৃতি তাহার অন্তরে জাগে। এ জাতি একদিন মুক্তিরই সাধনা করিয়াছিল। যে জাতির কথা, সর্ব্বং পরবশম্ দুঃখম্, সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্---সে জাতির কাছে ‘মুক্তি’, ‘স্বাধীনতা’ অপরিচিত বস্তু নহে; যে জাতির শত সহস্র বীর-সাধক পরবশ্যতা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সমরক্ষেত্রে ছুটিয়াছে, সে জাতির কাছে ‘মুক্তি’, ‘স্বাধীনতা’ অপরিচিত বস্তু নহে। সহজাত কবচ কুণ্ডল হারাইবার নজিরও ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্যে যেমন আছে তেমনি জাতির কৃতকর্ম্মে স্বাধীনতা খোয়ানো দীনতার

পরিচয় হইলেও, যে মুক্তিতে জাতির জন্মগত অধিকার, তাহাও তাহাকে খোয়াইতে হইয়াছে। যাক্, তবু সেই মুক্তির স্মৃতি জাতির অন্তরে জাগে। জাতির প্রবুদ্ধ মন সেই মুক্তির অভাবে বেদনা অনুভব করে। কিন্তু মুক্তি-হারা মুক্তিকামীদের পক্ষে ইহাই চরম কথা নহে। পরবশ্যতার বেদনা বোধ করা মাত্র নহে, কিন্তু পরবশ্যতার দুঃখ দৈন্য যখন মানুষকে অসোয়াস্তি আনিয়া দেয়, সমগ্র জীবনতন্ত্রে পরবশ্যতার বেদনায় বে-সুর বাজিয়া যায়, সেই অসহ্য দুঃখ দূর করিবার দুর্জ্জয় দুর্ণিবার ইচ্ছা যখন তাহার সমগ্র জীবনধর্ম্মে—যৌবনের অপ্রতিহত গতি বেগ আনিয়া দেয়,—সেই দুর্জ্জয় ইচ্ছাকে মূর্ত্ত করিতে যখন জাতি কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম-সাধনাকে একান্তে আশ্রয় করে, তখন, তখনই, 'দুয়ার খুলে যায় সোণার মন্দিরে।' দুনিয়ার কোন বাধাই আর তাহার মুক্তিদ্বারের অর্গল আঁটিয়া রাখিতে পারে না। দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত স্বাধীনতা-হারা, সুতরাং সর্ব্ব-হারা ভারতবাসীকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে, দাবীর কথা তবেই পরে বুঝা যাইবে।

ভারতের দাবীর নামে অনেক দাবী আমাদের অনেক রাজনীতিক নানা ভাবে করিয়াছেন, করিতেছেন। ভারতের দাবীটি কি? ভারত যাহা হারাইয়াছে, ফিরিয়া পাইতে চাহে তাহাই। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সে হারাইয়াছে। ভারতবাসীর অনেকের ধারণা ইংরেজ সেই স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিয়াছে, আর ইংরেজ তাহা ফিরাইয়া দিলে তবেই সে তাহা পাইবে।

কখনো স্বায়ত্বশাসনের নামে, কখনো স্বরাজ নামে ভারতের দাবী বলিয়া অনেক রাজনীতিকই এই দাবী লিখিয়া কহিয়া করিয়াছেন। কিন্তু সেই দাবী আমাদের মিটে নাই! দাবীর পিছনে নৈতিক জোর দিতে গিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ যুক্তি জন্ম-স্বত্বের কথাও বলিয়াছি, Swaraj is our birthright ঘোষণা করিয়াছি। কথাটা অতি সত্য, কিন্তু তবু ঐ birth-right, জন্মস্বত্ব সত্বেও আমাদের দাবী অমোঘ হয় নাই, ইহাও নিদারুণ সত্য!

মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা—মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড, জাতির একমাত্র শ্রেষ্ঠ 'ইজ্জৎ' স্বাধীনতা যে জাতি জাতীয় অক্ষমতার জন্য খোয়াইল, সে জাতির জন্মস্বত্বের দাবীর মূল্য কতটুকু? জন্মের অধিকার যে আমাদের কর্ম্মের উপরে জয়ী হইতে পারে নাই, আমাদের শত 'ন্যায্য দাবী'কে উপেক্ষা করিয়া যে বাস্তব রাষ্ট্রনীতিক বশ্যতা আজ মাথা উচু করিয়া আছে, তাহাতেই কি তাহা প্রমাণিত হয় নাই? যাহা জন্মস্বত্বে লাভ করিয়াছি, যাহাতে নাকি আমার birthright, তাহাও যখন পরের কাছেই চাহিতে হয়, 'দাবী' করিতে হয়, তখন কেমন করিয়া বলিব, আমার রাষ্ট্র-বুদ্ধি নিজের জন্মস্বত্বের উপরও আস্থাকে অবিচলিত রাখিতে পারিয়াছে?

তাই না আমাদের দাবী পেশ করিতে গিয়াছি ইংরেজের দরবারে! সেই দাবী ইংরেজ-দরবারে পৌছিয়াছে কিনা, জানি না, তবে বিশ্বরাজের দরবারে যে সে দাবী পৌছায় নাই, তাহা

জানি। দাবীর নাড়ী টিপিয়া পরখ করিতে ইংরেজ-বৈদ্যের ভুল হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ বিধাতার ত ভুল হইবার কথা নহে। যে দাবী অমোঘ, তাহাতেই বিশ্ববিধাতা জয়টিকা পরাইয়া দেন, আমাদের ইংরেজ-বিধাতার নারাজ হইলে তখন চলে না। ইংরেজ পদ্মার স্রোতধারা হয়ত বাঁধিতে পারে, কিন্তু জাতীয় দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, এত বল তাহার নাই;—ঐ উড়োজাহাজ, কামান, গোলা, বারুদ, কিছুতেই নাই। কিন্তু এই জাতীয় দাবী কোথায়? আমাদের দাবী পূরণ করিবার মালিক কে? ইংরেজ? কেমন করিয়া? কেমন কবিয়া তাহা সম্ভব হইল,—কবে? আমাদের ভাঙ্গা-গড়া, বাঁচা-মরা কি সত্যই ইংরেজের হাতে? এই ত্রিশকোটি নরনারীর ভাগ্যসূত্র জাতির হাতে নাই, জাতির ভাগ্য-বিধাতার হাতেও নাই—আছে তাহা ইংরেজের হাতে? এত বড় নাস্তিকের উক্তি কাহার? ইংরেজ আমাদের কতখানি হরণ করিয়াছে, আমরা কতখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছি—খোয়াইয়াছি, সেই হিসাব লইলেই দেখিব, আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব মধ্যমণি হরণ করিবার মালিকও ইংরেজ নহে, দিবার মালিকও নহে।

সে আজিকার কথা নহে। কত যুগ, কত যুগের কথা! ভারতের সেই সূচীভেদ্য অমানিশার আবরণ ভেদ করিতে পার কি? একদিন জঠরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া, বুকে অদম্য উৎসাহ লইয়া মুষ্টিমেয় ইংরেজ নাবিক-বণিক ভাগ্যান্বেষণে

ভারতের উপকূলে তরণী ভিড়াইল। সে-কথা আজ ইংরেজের কাছেও আব্‌ছায়া হইয়া গিয়াছে। যাক্, সেদিন ইংরেজের বণিক-বুদ্ধিও ধারণা করিতে পারে নাই যে, ভারতের এই কাণ্ডারীবিহীন রাষ্ট্রতরণীর কাণ্ডারী হইয়া তাহাকেই বসিতে হইবে। সেই দুর্য্যোগের রাতে আমরাই ইংরেজ-বণিকের আন্‌কোরা হাতে আমাদেব রাষ্ট্রতরণীর হালখানা তুলিয়া দিলাম। ইংরেজ-বণিক, ব্যবসায় বুদ্ধিতেই সেই হালখানা ধরিয়াছিল, ক্রমে শক্ত করিয়াই ধরিল! সে-দিন কাহার হাতে কি যে তুলিয়া দিলাম, কি পাইতে কি যে খোয়াইলাম,—'ওহো, কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথা, সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা।' থাক্—থাক্, ওকথা থাক্!

শতধা-বিভক্ত, আত্মকলহে ক্লিষ্ট, প্রবলের পীড়নে নিপীড়িত জনগণ পরবশ্যতার মধ্যেও পরিবর্ত্তনের রূপ দেখিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল!—তার পর, তারপর ইংরেজের সৌভাগ্য বিস্তৃতি নীরবে, মুগ্ধ-স্তম্ভিত-ভীত হইয়া দেখিল!

ক্রমে ইংরেজ তাহার সভ্যতার বেসাতি লইয়া আসিল। কেবল রাষ্ট্রে নহে, মনের দাসত্বও ক্রয় করিয়া ঘরে তুলিলাম।

ইংরেজের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া চলিতে গিয়া পদে পদে বাধা পাইয়া ইংরেজের সুখ-সম্ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার কাছে নিজেদের কেবলি দীনহীন 'ছোট' মনে করিতে লাগিল। সেই দীনতা দূর করিয়া নহে, সেই দীনতা লইয়াই 'পরদেশ গেলে, পরবেশ নিলে!' কিন্তু

তবুও, দাসত্বের লাঞ্ছনা শেষ হইল না। যে দাসত্বের ছাপ জাতির কপালে লাগিয়াছে, জাতির কাহাকেও তাহা নিষ্কৃতি দিল না,—পরদেশ, পরবেশ, পরভাষ, কিছুতেই দিল না। তারপর ইংরেজেরই দরবারে নিজেদের দুঃখ, অভাব, অভিযোগ জানাইবার মতিগতি দেখা দিল। ঐ ইংরেজের দরবারে আর্জি পেশ করিয়া ইংরেজের মতিগতি আমাদের অনুকূলে ফিরাইবার যথা-বিধি সাধ্যমত চেষ্টা চলিল। পরবশ ভারতের রাজনীতির জন্ম এই আবেদনের আস্তাকুড়ে ;—আত্মশক্তির, আত্মসম্বিতেব ঐশ্বর্য্যে নহে।

তা' হউক, পরবশ জাতির এই রাজনীতিও উপেক্ষণীয় নহে। কারণ যে-দিন ভারতবাসী ইংরেজের কাছে অভিযোগ উপস্থিত করিতেও ভরসা পাইত না, জন-কয় শিক্ষিত ভারতবাসীর চেষ্টায় সে-দিন কিন্তু অতীত হইল। শুধু তাহাই নহে, এই সকল শিক্ষিত ভারতবাসীরাই প্রাদেশিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী হিসাবে ভারতের কথা তথা মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই আশা আকাঙ্ক্ষার কথা কংগ্রেসের মারফতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাতে করিয়াই দেশাত্মবোধ দেখা দিল, প্রবুদ্ধ ভারত ভারতের রাষ্ট্রগগনের জমাট তমিস্রা ভেদ করিয়া দীপালি উৎসবের উদ্যোগ পর্ব্বের সূচনা করিয়া দিল। যাক্, কংগ্রেসের সেই দাবী ইংরেজের কাছেই হইল, জাতির কাছে নহে। সেই দাবী আজিও চলিয়াছে। আজিও ইংরেজের কাছেই দাবী করিতে আমাদের অধ্যবসায়।

ভারতের দাবী

আমাদের দাবী পূরণ করিবার মালিক ইংরেজ, এই চেতনাই আমাদের দাবীকে পঙ্গু করিয়া রাখিল—অমোঘ করিল না,—তাই আমাদের দাবী কখনো প্রার্থনার দীনতা হইতে মুক্তি পাইল না। এই দাবী পূরণ করিবার কোনও তাগিদ ইংরেজের মধ্যে দেখা দিল না। যে দাবীর পিছনে শক্তি থাকিয়া দাবীকে দুর্জ্জয় করে, এ যে সেই জাতীয় দাবী নহে, ইহা ইংরেজ বুঝিল। ভারতের রাজনীতির প্রথম স্তরের আবেদন-নিবেদন, দ্বিতীয় স্তরের হুম্‌কি, তৃতীয় স্তরের বর্জ্জননীতি, সর্ব্বত্রই ইংরেজের কাছেই দাবী জানাইবার আয়োজন; সেই দাবী নরম সুরেই হউক, গরম সুরেই হউক, তাহা যে নিছক প্রার্থনা—প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা কে না জানে?

কিন্তু সে যাক্, আজ ত আমাদের বুঝিতেই হইবে, দাবী সত্য হইল না কেন, দাবী আমাদের অমোঘ হইল না কেন, বিধাতার আশীর্ব্বাদ পাইয়া দাবী আমাদের জয়যুক্ত হইল না কেন?

যে দাবী যেখানে—যে দরবারে করিতে হয়, সেখানে, সে দরবারে যদি না পৌছায়, তবে কেমন করিয়া ভারতের দাবী জয়শ্রীকে লাভ করিবে? ভারতের যাহা দাবী, তাহা ভারতের কাছে, ভারতের তেত্রিশকোটি মহামানবের দরবারেই আজ পেশ করিতে হইবে। ভারতের শক্তির—মুক্তির ইহাই পথ। এই বিরাট্ জাতি যদি একবার এই দাবী গ্রাহ্য করিয়া

লয়, বিধাতারও সাধ্য নাই তাহা অগ্রাহ্য করে, ইংরেজ ত শুধুই ইংরেজ!

দুর্ব্বুদ্ধি কি আমাদের কম? গত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া ইংরেজকে আমাদের দাবীর কথা শুনাইতে, ঐ দরবারে দাবী পৌঁছাইতে যে সময়, শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ ব্যয় করিয়াছি, দাবীর ডেপুটেশন-আবেদন-নিবেদন লইয়া যে দুর্ভোগ ভুগিয়াছি, ভারতের কোটি কোটি নরনারীর দরবারে সেই দাবীর কথা যদি শুনাইতে পারিতাম, সেই শক্তি, সামর্থ্য, সময়, অর্থ যদি এইখানেই ব্যয় করিতে পারিতাম, ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি ফিরাইতে নহে, ইংরেজের শুভ বুদ্ধি জাগাইতে নহে, ভারতেরই এই দরবারের কৃপাদৃষ্টি ফিরাইতে, শুভবুদ্ধি জাগাইতে যদি ব্যয় করিতাম, দাবী নিষ্ফল হইয়া ফিরিত না।

আমার যাহা দাবী, তাহা আমিই যদি কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়া না লই, বাহিরে শত আবেদনে বা আস্ফালনে সে দাবী কি কখনো আমাকে জয়মাল্য আনিয়া দিতে পারিবে? আজ ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রবুদ্ধ বুদ্ধিকে নিশ্চিত, নিঃসংশয়ে বুঝিতে হইবে, ভারতের দাবী আজ ভারতের দরবারেই পেশ করিব, ইংরেজের দরবারে নহে। ভারতের সমগ্র চেতনা যদি সেই দাবীকে বরণ করিয়া লয়, তবেই দাবী অপ্রতিহত—অমোঘ হইবে, তখনই ভারতের দাবী প্রার্থনার দৈন্য হইতে মুক্ত হইবে;—আস্ফালন না করিলেও চলিবে, আবেদন না জানাইলেও মিলিবে।

কথাটা বুঝিয়া দেখিতে হয়। ইংরেজ কি দিতে পারে, সেই দিকে চাহিয়াই আমাদের রাজনীতিকরা নিজ নিজ ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুসারে 'দাবী' করিতে বসিয়াছেন, আমরা কি চাই, কি না হইলে আমাদের চলে না, কোনও জাতিরই চলে না, সেই কথাটা আমাদের দেশবাসীকে আজিও তেমন বিচলিত করে নাই। কেমন করিয়া দাবী জানাইলে ইংরেজ খোস মেজাজে রাজী হইয়া আমাদের স্বরাজ বর দিবেন, কেমন করিয়া হুম্‌কি দেখাইলে ইংরেজ ঘাব্‌ড়াইয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া বাঁচিবে, এই দিকে নজর রাখিয়াই আমরা দাবী করিয়াছি; তাই দাবী আমাদের অপ্রতিহত দুর্জ্জয় হইতে পারে নাই। কিন্তু ভারতের যাহা দাবী, অর্থাৎ যাহা না হইলে, না পাইলে আমাদের চলে না, সেই দাবীর কথা কিন্তু নবজাগ্রত ভারতকে ভারতের ত্রিশকোটি লোকের কাছেই উপস্থিত করিতে হইবে। এই দাবী ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর সমগ্র চেতনা স্বীকার করিয়া লউক, ভারতের কোটি কোটি মানব কায়মনোবাক্যে এই দাবীকে মঞ্জুর করুক, তবেই হইবে ইহা জাতীয় দাবী; সেই দাবীর অপ্রতিহত গতি-বেগ প্রতিরোধ করিবে কে?

দাবীকে অমোঘ না করিয়া দাবী করিতে নাই। প্রার্থনা নহে, ভিক্ষা নহে। মুক্তির দাবী, জাতি অধিকারের শুল্কে চাহিবে,—সেই অধিকার নিজের কাছেই সর্ব্বাগ্রে সাব্যস্ত করিতে হইবে, ইংরেজ ত অবান্তর। বন্ধনের বেদনা আর বহিব না,

চাই সর্ব্বপ্রকার দাস্য হইতে মুক্তি—মনুষ্যত্ব অন্যথায় বাঁচে না,—ইহাই দাবী। এই দাবীর কথাই জাতিকে শুনাইব। এই অধিকারই আজ এখানে সাব্যস্ত করিব। এই অধিকার এতই স্বাভাবিক ন্যায্য যে. অপর কোথাও এই অধিকারের দাবী জানাইতে গেলে জন্মগত অধিকারের ন্যায্যতাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের, তাহাই ত ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। নিজেদের অধিকারেও আমাদের আস্থা নাই। তাই, যাহা নাকি জাতির জন্মগত অধিকার, তাহা লইয়াও আমাদের যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিবার দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। করিতে হয় এই জন্য যে, জাতির যাহা দাবী, তাহা জাতির দরবারে পেশ না করিয়া ইংরেজ-দরবারে পেশ করিবার দুর্ম্মতি আমাদের ছিল।

দাবী করিবার মুখেই আজ জাতিভেদ, অবরোধ-প্রথা, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা আসিয়া আমাদের মাথায় সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি আমাদের গৌরবের বস্তু নহে, কিন্তু যে স্বরাজে আমার জন্মগত অধিকার, তাহা লাভের পক্ষে এগুলি অন্তরায় হইবে কি না, এই চিন্তা, ইংরেজ দরবারে আমাদের স্বরাজের দাবী পেশ করিতে গিয়াছি বলিয়াই না দেখা দিয়াছে? ইংরেজের মনের দিকে, বক্তৃতার দিকে, লেখার দিকে তাকাইয়া দাবী করিতে হয় বলিয়াই না এই চিন্তা আসিয়াছে? যদি এই দাবী, ইংরেজ নিরপেক্ষ হইয়া ভারতের এই বিরাট জনশক্তির

দরবারেই পেশ করিতে পারিতাম, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তির অন্তরায় বলিয়া কল্পনাও করিতে পারিতাম কি? কোন জাতিই পারে কি? আমরা রাষ্ট্রীয় দাবী জানাই, আর ব্রিটিশ রাজনীতিক তাহা তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, আমরা জাতীয় উন্নতির কথা বলি, ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ভারতের নাবালক জনসাধারণের প্রতি তাহাদের স্বর্গীয় কর্ত্তব্যের কথা শুনাইয়া, আমরা যে অরাজক রাজ্যের সূচনা করিয়া মরিব, সেই আশঙ্কায় দাবী নামঞ্জুর করেন; আমরা নিষ্ফল হুম্‌কি দেখাই, ব্রিটিশ রাজনীতিকরা সার্থক সৈন্যের কুজ কাওয়াজ দেখান, আমরা সংখ্যার হিসাব দেখাই, ব্রিটিশ রাজনীতিকরা হিসাবে গলদ বাহির করিয়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বাহির করেন—অস্পৃশ্যতা আবিষ্কার করেন; আমরা, 'তাইত' 'তাইত' করিয়া নিজেদের দোষ শোধরাইতে ততটা নহে, কিন্তু ইংরেজের ঐ তথাকথিত ধারণা উল্টাইয়া দিতে, দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ভারতের প্রবুদ্ধ রাষ্ট্রনীতিক কর্ম্মীদের এই অভিনয়ের অঙ্ক শেষ করিতে হইবে। জাতির স্বরাজের দাবী কোনও নজির দেখাইয়াই যে কোনও জাতি কখনো প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকারী নহে, ইহা বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে, আর তাহা বুঝিয়াই ভারতের দাবী, ভারতের জনগণের (তাহারাই ভারতের ভাগ্য-বিধাতা) দরবারে পেশ করিতে হইবে। তাহারা দাবীকে স্বীকার করিলে অস্বীকারের ভয় কোন

দিক্ হইতেই নাই। আর তাহারাই যদি দাবীকে আপনার করিয়া না লয়, পরের কাছে দাবী করিয়া মরিয়া লাভ?

বলিয়াছি ত, জন্মগত অধিকারের বড়াই চিরন্তন নহে। জন্মস্বত্বে কিছু অর্জ্জন করা যেমন চলে, কর্ম্মসূত্রে তেমন বর্জ্জন করার নজিরও আছে। জন্মের অধিকার কর্ম্মের অধিকারের উপর জয়ী হইবেই, বাস্তবক্ষেত্রে তেমন নজির কৈ? সুতরাং অধিকার কর্ম্মগত হইয়াই সাব্যস্ত হইবে। দাবী মিটাইবার মালিক ভারতের ত্রিশ কোটি মহামানবের দরবারে আমাদের স্বরাজ ও স্বাধীনতার—যে স্বরাজ ও স্বাধীনতা মানুষের মনুষ্যত্বের প্রথম পরিচয়, যাহা স্বর্গ হইতে সম্পদশীল, মাতৃ-বক্ষের মত পরম নির্ভরস্থল—মাতৃমূর্ত্তির মতই মহিমময়ী, মাতৃনামের মতই যাহা অমৃতময়, সতীর সতীত্বের মতই যাহা ধ্রুব,—সেই স্বরাজ ও স্বাধীনতার দাবী পেশ করিব। তারপর এই দরবারের রায় যদি পাই, বিশ্বরাজের দরবারের পঞ্জা তবেই পাইব; ব্রিটিশ দরবার নারাজ হইলে তখন চলিবে কেন? ভারতের ভগবান, ভারতের দাবী কোথায় করিতে হইবে, সেই শুভবুদ্ধি ভারতবাসীর অন্তরে জাগাও, দাবী করার সুসময় যে বহিয়া যায়!

স্বদেশী

একদিন, ইংরেজ ব্যবসায়ী, ব্যবসায়-বুদ্ধিতেই ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। পথেব মধ্যে ভারত-সাম্রাজ্যটা মালিকহীন বস্তুর মতই বুঝি লুটাইতেছিল দেখিয়া—ইংরেজ ব্যবসায়-বুদ্ধিতেই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিল।

আমরা ধার্ম্মিক ভারতবাসী, সেদিন কোন্ ধর্ম্মচর্চ্চায় লিপ্ত ছিলাম, জানি না, তবে ভারতের কঙ্কাল আমাদের দেখিয়া আজ সে ধারণা করাও অসম্ভব হইবে না। আমাদের বুদ্ধি-মনীষা, সেদিন ভারতের কোন্ মহাসমস্যা সমাধানে মহাব্যস্ত ছিল, জানি না—অর্থ, শক্তি কোন্ গৃহকলহে নিঃস্ব হইয়াছিল জানি না, আমাদের দেশপ্রীতি সেদিন কোন্ মহাদেশের অচিন্তনীয় তথ্যের অনুসন্ধানে নিজেব ঘরের ক্ষুদ্র কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই, জানি না, তবে সমগ্র ভারত তাহার দীনতা লইয়া মরা মানুষের মত, ইংরেজ-ভাগ্যবিস্তৃতি সেদিন দেখিয়াছে!

ফলে, ভারতবর্ষ কি পাইয়াছে, আর কি যে হারাইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষ কেমন করিয়া—কবে লিখিবে? কোন্ শিক্ষা, সভ্যতা, শান্তি, বিজ্ঞান ভারতবর্ষ পাইয়াছে? যাহারা তাহা

পাইয়াছে, তাহারা বলুক; জাতি হিসাবে ভারত যাহা পাইয়াছে, ভারত তাহাই ত বলিবে,—যাহা পায় নাই, তাহার বড়াই ত সে করিতে পারিবে না!

ইংরেজ অমানুষী শক্তিতে একটা সাম্রাজ্য গড়িয়াছে,—আইন, আদালত, বিচারপদ্ধতি নিয়মিত করিয়াছে, রাস্তা-ঘাট, ট্রেন, ষ্টীমার, সেতু গড়িয়াছে; শিক্ষা, সভ্যতা এদেশে আনিয়াছে, সত্যই! কিন্তু জাতি হিসাবে ভারতবাসী তাহার কি পাইয়াছে?

ইংরেজের গড়া-সাম্রাজ্যে আমরা গড়া-কর্ম্মচারী; তাহার আদালতে, তাহারই শিক্ষায় আইনব্যবসায়ী। তাহাব রেলে, ষ্টীমারে আরোহী, তাহার উদ্ভাবিত শিক্ষায় শিক্ষিত; তাহার যান-বাহন, কল-কব্জা, বিজ্ঞান-যন্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত—আমার সৃষ্টির চেতনা কিন্তু এখানে নাই! এই কথাটা মনে রাখিও।

আজ ভারতবাসী জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইংরেজ-প্রভাব শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করিতেছে। আজ ভারতবর্ষের যতখানি ঐশ্বর্য্য তাহাতেই, অন্ধ ভাবত বোঝে না, তাহার হীনতা ফুটিয়া উঠে কতখানি!

আজ একই দিবসে কাশী যাই বটে, বিজলী বাতিতে নগর-লক্ষ্মী তাহার আঙ্গিনা সাজায় বটে, কিন্তু আজিকার আধুনিক রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, বিচারপদ্ধতি—এ-সমস্তের মধ্যে ভারতের দীনতাই কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজা-মহারাজের বা কোন সাহেব-কোম্পানীর আরদালী যখন নির্দ্দিষ্ট মূল্যবান্ তক্‌মা-আঁটা

পোষাক পরিয়া, সে পোষাকে গর্ব্ব অনুভব করিয়া বাহির হয় —তাহা যেমন হেয়, তাহার নিজের নগ্ন দীনতাকে পরদত্ত ঐশ্বর্য্যের আবরণে ঢাকিয়া আরো বিশ্রী করিয়া তোলে, ভারতবাসী যখন ইংরেজের সৃষ্ট, ইংরেজের দেওয়া বস্তুতে গর্ব্ব করে, তখন তাহার জাতীয় হীনতাও তেমনি একেবারে বিশ্রী-নগ্ন হইয়া উঠে—অন্ধ ভারত এতকাল তাহা বুঝে নাই। কথাটা একটু খেয়াল করিয়া বুঝিতে হইবে। মনেও ভাবিও না, এ কোন বিদ্বেষের কথা বা বর্জ্জনের কথা, এ কেবলি নিজের স্বরূপকে নিজের জানিবার কথা। এ অর্জ্জনের কথা; আজ দীনতার সমস্তখানি মূর্ত্তিই আমার জানা চাই—আজ এই ঘরে ফিরিবার—ইহাই শ্রেষ্ঠ কথা।

মনে পড়ে, একদিন বারানসীতে, গঙ্গার ধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণ, পাষাণের সিঁড়ি, স্তম্ভ, আরো অনেক কিছু দেখিলাম। সে যে চমৎকার তাহা নহে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে এত পবিত্র কেন? ওর প্রত্যেকখানা পাথর আমার দেশের লোকের তৈরী, ওর মুটে মজুর, 'ইঞ্জিনিয়ার' 'প্ল্যান-মেকার' আমাব দেশীয়, ভুলভ্রান্তি দেশীয়, গুণগরিমাও দেশীয়—এ যে আমার, হাঁ, একান্ত করিয়াই আমার, আমার সেই স্বজনের মঙ্গলবুদ্ধি, চেতনা, মঙ্গলহস্ত ইহার স্রষ্টা; ইহার ভুল ভুল বটে, ইহার ভ্রান্তি ভ্রান্তিই বটে, ইহার অবৈজ্ঞানিক প্রভাব বিজ্ঞান-চর্চ্চার অভাব বটে—কিন্তু আমার জাতীয় চেতনা এখানে আছে,—ইহাই স্বদেশী।

স্বদেশী

আজিকার সহস্র সহস্র অট্টালিকা, সুন্দর চমৎকার শিক্ষাপ্রদ যাদুঘর, বিজ্ঞানশালা, উচ্চ বিচারালয়, প্রশস্ত রাজ-পথ, প্রশস্ত সেতু, বিস্তৃত রেলপথ, বৈদ্যুতিক আলো-পাখা, শিক্ষাশালা—এ সমস্তের মধ্যে আমার জাতীয় চেতনা কোথায়?—ইংরেজের কৌশলী হস্ত, ইংরেজের সৃজনী ক্ষমতাকে বাদ দিলে আমার যাহা থাকে, সে ত আমার জাতীয় গর্ব্বের নহে, সে-যে জাতিহিসাবে আমার দৈন্যের কথা। আমার বুদ্ধি-চেতনা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এখানে নাই,—যাহা আছে, তাহা কুলি-বুদ্ধি, কোন প্রভুবুদ্ধি এখানে নাই।

এ দৈন্যের কথা ভারতবাসী বুঝ কি?—আজ রাস্তায় চলিতে, ট্রাম-মটরে, যান-বাহনে, রেল-ষ্টীমারে, আরাম-ভ্রমণে, বৈদ্যুতিক আলো-পাখা উপভোগে, আজ উচ্চ শিক্ষালাভের সময়ে, বিজ্ঞান-যন্ত্রের সান্নিধ্যে, নানা শিক্ষাপ্রদ প্রতিষ্ঠানে, আমোদে-প্রমোদে এই কথাটা ভারতবাসী মনে রাখিও, জাতিহিসাবে এ তোমার সৃষ্টি নহে; সুতরাং এ তোমার সম্পত্তি নহে। যাহা পরের দান, তাহাই স্বদেশী নহে। অথচ এ স্বদেশী ছাড়া দেশ বাঁচে না, জাতি বাঁচে না,—আমরাও বাঁচিয়া নাই—কেবল 'জ্যান্তে-মরা' হইয়া আছি।

যে নির্ম্মাণ (construction) ব্যাপারে আমার জাতির মঙ্গলবুদ্ধি ও মঙ্গলহস্ত নাই সে ত আমার নহে; তাহা আমি হীনতার বোঝা মাথায় না লইয়া জাতিহিসাবে কেমন করিয়া গ্রহণ করিব?—আজ দীন হইয়াছি, দীনই থাকিব; কিন্তু হীন

হইব না। যদি হীন না হই, তবে দীনতার মধ্যেই আমার জাতীয় ঐশ্বর্য্য ফুটিবে। আজ বিধাতার বিধানে, জাতির কর্ম্ম বিমুখতায় দীন হইয়াছি, দীনের মতই থাকিব; দীন ভারত যাহা দেয় তাহাই—দীন আমি—আমার শ্রেষ্ঠ বস্তু। আমি দীন হইয়াও যদি পরের 'তকমা' আঁটিয়া নিজের দীনতার কথা ভুলিতে চাই, তবে যে আমার হীনতা কুৎসিত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, একথা আজ আমার বুঝা চাই। স্বদেশী ইহাই। ইহাই বাঁচিবার কথা—জগতের সকল জাতিই এমন 'স্বদেশী' হইয়াই বাঁচে।

ভারত আজ দীনতার ভারে কুব্জ। সমস্ত বিলাসিতায়, আরামে-মোহে-অলসতায়, পরদত্ত সমগ্র বস্তু সম্ভোগের বাসনায় —আজ এক অসোয়াস্তি আনিয়া দিতেই হইবে!

এ অসোয়াস্তি, সৃষ্টি করিবার ব্যাকুলতা! এই সৃজনেই কুব্জ ভারত সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, অসাধ্য সাধন করিবে; জগতের সভ্যতাশালায় ভারতের নিজস্ব দান ভারত জাতি-হিসাবেই দিবে। ভারতকে সেই সর্ব্ববন্ধন-মুক্তির কথাই ভাবিতে হইবে। ভারতকে চিন্তায়, কর্ম্মে, আহারে, বিহারে, শিক্ষায়, সভ্যতায় স্বরাট্ হইতে হইবে—ভারতবাসীর প্রভু-চেতনায় এ সমস্ত সুন্দর, পূর্ণ ও সার্থক করিয়াই আত্মারাম হইতে হইবে। ভারত আজ চৈতন্য লাভ করিয়া ইহাই বুঝিয়াছে, তাই ঘরে ফিরিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু এই ঘরে ফিরিবার কথায়ও গোল আছে। কথাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দেখা যাক্।

স্বদেশী

আজ ডাক পড়িয়াছে, ঘরে এস, ঘরে ফিরিতে হইবে—কিন্তু ঘর কোথায়? কোথায় ফিরিলে সত্যকার ঘরে ফেরা হইবে? ঘর কি, না স্বদেশ। স্বদেশে ত আছি, ফিরিব কোথায়? তাই বুঝিতে হয়, স্বদেশ আমার কোন্‌টা। স্বদেশ কি! যেখানে মানুষ জন্মে,—সৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়, মানুষ হয়, তাহাই স্বদেশ, যাহাতে সৃষ্টি হয়, পুষ্টি হয়, মনুষ্যত্বলাভ হয়, তাহাই স্বদেশী। সেই মায়ের মত সৃষ্টি করিয়াছেন, পুষ্ট করিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই স্বদেশ আজ দেশ-মাতৃকা! মাটিকে দেশ বলে না, জাতির সমগ্র সাধনা যেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাকে জীবন দিয়াছেন, নিত্য দিতেছেন ও পরেও দিবেন, তাহাই আমার দেশ—স্বদেশ। এই স্বদেশই স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই স্বদেশ-সাধনাই আমার ধর্ম্ম।

কারণ, এই স্বদেশ ভিন্ন সৃষ্টি হয় না, পুষ্টি হয় না—ধর্ম্ম হয় না। এই স্বদেশে কেমন করিয়া ফিরিব? স্বদেশ কি, জানিলে ফিরিতেও পারিব। আজিকার হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-পার্শীর স্বদেশ কোন্‌টা, স্বদেশীই বা কোন্‌টা; ঐ যে বুনো জাতিগুলি, ভারতের প্রকৃত মালিক, ওদের স্বদেশ কোথায়! ওদের মা আজ বিমাতা হইয়াছেন—ওরা ত সৃষ্ট বা পুষ্ট হইল না। উত্তর মেরুর অধিবাসী সেই আর্য্য, বর্ত্তমান ভারতবাসী আমরা—আমাদের স্বদেশ কোথায়—আমাদের সৃষ্টি-পুষ্টি কোথায়? মুসলমান, পার্শী বা খৃষ্টান, তোমার স্বদেশ কোথায়—তোমার সৃষ্টি-পুষ্টি কোথায়? কোথায় কোন্ সাধনায় তুমি মানুষ হইবে? আজ কোন্ ঘরে

ফিরিবে, কোন্ স্বদেশে যাইবে—ভারত কি তোমাদের সকলেরই স্বদেশ, ভারতীয় যাহা, তাহা তোমার স্বদেশী? ভারতীয় যাহা, তাহাই কি তোমার জাতীয়তা? বুঝিয়া দেখিও, কোন্ জাতীয়তা গ্রহণ করিতে, কোন্ বিজাতীয়তা বর্জ্জন করিতে হইবে—তাহা আজ ভারতবাসী বুঝিয়া দেখিও, তাহা না বুঝিলে, হিন্দু-মুসলমান, পার্শী-খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সকলের সম্মিলিত ভারত-সাধনা কেমন করিয়া হইবে? তাইত যখনই জাতীয় কিছু করিতে যাই, কেবলই মনে হয়, ভারতের জাতীয়তা কোন্‌টা? 'স্কুল-কলেজ' নাম ফেলিয়া দিয়া 'বিদ্যায়তন' নাম দিতে পারিলেই বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের স্বদেশে ফেরা হইবে কি না, সেই কথাই ত মনে জাগে। ইংরেজের building, মুসলমানের দালান নাম ফেলিয়া, হিন্দুর কুঠীর বা আরো একটু গিয়া কোল-ভীলের গুহায় যাইতে পারিলেই ভারতের জাতীয় ভাব আসিবে কি? স্বদেশী হইবে কি? ঘরে ফেরা হইবে কি? জাতীয় কোন্‌টা, কোট, প্যাণ্ট, ইজার, চাপ্‌কান্, ধুতিচাদর, বাঘছাল, ইহার কোন্‌টা আমাদের—জাতীয়? 'কোর্ট' ছাড়িয়া, 'আদালত' ফেলিয়া 'বিচারালয়ে' আসিলেই কি ঘরে ফেরা হইবে? কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা গ্রহণ করিলে আজ আমাদের স্বদেশে ফেরা হইবে, তাহাই বা কে বলিবে? সেই শক, হূন, গ্রীক, যবন প্রভৃতির শিক্ষা-সভ্যতাকে বাছিয়া কোন্‌টা ভারতীয়, কোন্‌টা অ-ভারতীয়, তাহার মীমাংসা কেমন করিয়া আজ করিব? আমরা বলি, তাহা বাছিয়া প্রয়োজন নাই। ভারতের হিন্দু-মসলমান, পার্শী-

খৃষ্টান সকলেরই বাঁচিবার রীতি-নীতি যাহা, তাহাই আমার জাতীয়তা—তাহাই স্বদেশী। যে সৃজনব্যপারে তাহার প্রভু-বুদ্ধি জয়যুক্ত, তাহাই স্বদেশী—যেখানে সে সৃষ্ট-পুষ্ট, তাহাই—স্বদেশ। আজ মুসলমান ভারতকে যদি স্বদেশ বলে, তাহা হইলে একেবারে তাহার মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে,—এই স্বদেশে সে সৃষ্ট, পুষ্ট, রক্ষিত ও মানুষ হইয়াছে। যাহাতে সে আজিও সৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়, মানুষ হয়, তাহাই তাহার স্বদেশী—তাহাই তাহাব গ্রহণীয়। নতুবা কোন 'উৎকৃষ্ট' স্বদেশীর নামে, যাহা তাহাকে আজিও সৃষ্ট করে না, পুষ্ট করে না, মানুষ করে না, তাহাতে ফিরিয়া যাইতে নিজের শক্তিকে ব্যয় করা, যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত নহে। তেমনি, হিন্দু-খৃষ্টান-পার্শী প্রভৃতির সকলেরই স্বদেশ ও স্বদেশী কোন্‌টা—আজ বুঝিতে হইবে। নতুবা, যাহা নিষ্প্রয়োজন, যাহা আমার মনুষ্যত্ব-বৃদ্ধির উপায় নহে, তাহাকেই একটা অতীত নামের মোহে আঁকড়াইয়া সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়া, শক্তি-সংগ্রহের সময়, সৃষ্টির সময়ই যদি আমি শক্তিহীন দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, তবে প্রকৃত কর্ম্ম করিব কখন? কতটা টিকি বা ফোঁটার চর্চ্চা করিয়াছি, কতটা প্যাণ্ট-কোট ছাড়িয়াছি বা ধরিয়াছি, তাহা আজ মোটেই বড় কথা নহে। সৃষ্টির গৌরব হইতে বঞ্চিত জাতির টিকি-ফোঁটায় স্বদেশী হওয়া যায় না, সৃষ্টি করিতে পারিলে প্যাণ্ট-কোটেও আটকায় না—স্বদেশী-পক্ষে এসব বড় কথা নহে। বড় কথা, কতটুকু স্বদেশী হইয়াছি। এখন একটা কথা উঠিবে

তবে ভারতবাসী আমরা কি প্যাণ্ট-কোটও পরিতে পারি? উত্তর, 'ভারতবাসী' আমরা যদি ধুতিচাদর, চোগা-চাপকান পরিতে পারি প্যাণ্টই বা পরিতে পারিব না কেন? তবে, যে প্যাণ্ট-কোট, চোগা-চাপকান, ধুতিচাদর আমার কাছে বিজাতীয় অর্থাৎ যাহাতে আমার সৃষ্টি, পুষ্টি, মনুষ্যত্বলাভে বাধা দেয়, তাহাই বর্জ্জনীয়, তাহাই বিদেশী। যাহা কেবলই অনুকরণ করিতে, পরের জন্য গ্রহণ করি তাহাই আমার বিদেশী, কারণ তাহাতে আমার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়—সৃষ্টি, পুষ্টি এককালে বন্ধ হয়। যাহা আমাকে সৃষ্টি করে ও শ্রেষ্ঠ করে, তাহাই স্বদেশী। এই কথা যদি বুঝি, তবে জাতি গড়িতে কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জ্জনীয়—সহজেই বুঝিব। তাহা হইলেই গ্রহণ ও বর্জ্জন দেশ-কাল-পাত্রকে সহায় করিয়া একান্ত ভারত-ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিজয়ী গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা যখন জাতি সৃজনের প্রয়োজনে তুর্কীর প্রাচীন ঘোমটা তুলিয়া ফেলিতে চাহেন—প্রতিযোগিতায় জাতিকে বাঁচাইতে ইউরোপীয় পোষাক নব্য তুর্কীকে গ্রহণ করিতে বলেন—তখন বুঝিও তিনি স্বদেশীর কথাই বলিতেছেন। জাতি যাহাতে সৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়, তাহাই ত স্বদেশী।

যাহারা শতধা বিচ্ছিন্ন, যাহাদের অতীত ইতিহাসের মূলকেন্দ্র এক জায়গায় আবদ্ধ নহে, তাহাদের দেশাত্মবোধ, অতীতকে কেবলই একান্ত করিয়া ধরিলে জাগিবে না। বর্ত্তমানের সত্যকার যে ভারত, যে ভারত জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও এক

বৈচিত্র্যে বিশিষ্টতা পাইয়াছে, ভারতীয় বলিতে যাহার ঐ সমগ্র বিশিষ্টতাটুকুই বুঝায়, সেই অখণ্ড ভারতজ্ঞানে দেশাত্মবোধকে জাগাইতে হইবে। আজ যেখানে আমি সৃষ্ট, পুষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিব, তাহাই আমার স্বদেশ—তাহাই আমার ধর্ম্ম, তাহাই আমার ঘর। সেই ঘর কোন প্রাচীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কোন নব্যতন্ত্রের ভিত্তির উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই ঘর কোন উত্তর মেরুর পিতৃস্থানেও প্রতিষ্ঠিত নহে, পারস্থ-তুরস্কেও নহে। সেই ঘর এই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের চেতনার মধ্যে। আজ ভারতের এই যুগধর্ম্মই ভারতবাসীর সাধনার বিষয়, সেই সাধনাই স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান-পার্শীর মিলনভূমি সেই স্বদেশেরই মধ্যে। সেই স্বদেশ ও স্বদেশীই তাহাকে সৃষ্টি করিবে, পুষ্ট করিবে, শ্রেষ্ঠ করিবে। এই স্বদেশে ফিরিতে পারিলে, এই স্বদেশী হইতে পারিলেই আমরা স্বভাবতঃই আত্মারাম হইব, স্বপ্রতিষ্ঠ হইব, স্বরাট্ হইব, সেইখানেই সৃষ্ট, পুষ্ট ও শ্রেষ্ঠ হইব। কর্ম্মের মধ্যে, শক্তি-সংগ্রহের মধ্যে, ক্রম-বর্দ্ধমান সংগঠনের মহিমার মধ্যে আমার সেই স্বদেশ—সেই স্বদেশী; সুতরাং আমার ভারত-ধর্ম্ম জীবন-ধর্ম্ম বিদ্যমান—। তাহা কোন জীর্ণ পুঁথিতে নাই বা কোন নব্যতন্ত্রেও নাই, সেই ভারতের রামরাজত্বে নাই—বর্ত্তমান বলশেভিকবাদেও নাই—তাহা আছে, আজিকার এই বিচিত্র ভারতের ত্রিশকোটী লোকের স্বাধীন চেতনার মধ্যে—মুক্ত, উদার, টাট্কা, তাজা চিত্ত-ক্ষেত্রে

—আর সর্ব্বগ্রাহী মনের মধ্যে। তাই ত আজ স্বদেশী হইতে বলি। যে স্বদেশী হইতে হইলেই সৃষ্টি করিতে হইবে—পরের মুখের দিকে না তাকাইয়া সৃষ্টি করিতে হইবে, সেই স্বদেশী হইতে বলি—। যেখানে কর্ম্ম আছে কথা নাই, শক্তি আছে অভিমান নাই, আত্মবিশ্বাস আছে বলিয়া হীন বিদ্বেষ নাই, যথার্থ বীরত্ব আছে কিন্তু বীরত্বের অভিনয় নাই, সেইখানে, সেই স্বদেশে, স্বরাজে ফিরিতে বলি—নাটক করিয়া, নাটুকে স্বরাজ আজই পাই কি কালই পাই তাহা আমাকে মুক্ত করিতে পারিবে না। বলিয়াছি ত প্রভু বুদ্ধি জাগাইতে হইবে। যে ঐশ্বর্য্যে আমার সৃজন-বুদ্ধি সুতরাং প্রভুবুদ্ধি নাই, তাহা আমার দীনতার নিদর্শন, আর যাহাতে আমার সৃজন-বুদ্ধি আছে, প্রভুবুদ্ধি আছে, তাহা ভাঙ্গা কুড়ে হইলেও তাহাই গৌরবের, কারণ তাহাই স্বদেশী। যাহা স্বদেশী নহে, অথচ যাহা নাকি আমার 'অপরিহার্য্য', তাহাই অগৌরবের—আমার প্রাণ-শক্তি তাহাতেই হইবে পঙ্গু।

ভারতের দাবীকে অপ্রতিহত করিতে এই স্বদেশীর সেবা করিতে হইবে।

শক্ত-মানুষ

কেবল ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের দ্বারাই নদীর সব খানি 'পারি' কাটাইয়া উঠা যায় না—ঐ নদীর তোড়ের মধ্যে কোঁথাও এমন খট্‌কা আছে, যেখানে হিসাব-হারা বুকের শক্তিই কেবল 'পারি' জমাইতে পারে, পারে তরণীখানা পৌঁছাইতে পারে। তাইত আজ শক্ত-মানুষ চাই।

· আমাদের দেশেব কোন কোন জেলায় বিবাহে স্ত্রী-আচারে বরেব হাতে কাঁচা বাঁশের কঞ্চি দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য, বরটি যেন কাঁচা বাঁশের মতই সময়ে অসময়ে এদিক ওদিক নোয়ায়, ভাঙ্গে না যেন। উদ্দেশ্য সাধু! কিন্তু এমন এদিক ওদিক হেলিয়া যাওয়ায় স্ত্রী-আচারের মালিকদের কাছে বর-পুরুষটি যতই প্রিয়তর হইয়া উঠুন, আজিকার জাতীয় সমস্যায় তাহার মূল্য ত কানা কড়িও হইবে না।

আমরা শান্ত, শিষ্ট, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, 'সুসভ্য' বটেই,—এমন কি, জ্ঞানীও আমাদের মধ্যে আছেন, বৈজ্ঞানিকও আমাদের মধ্যে মিলিবে, কিন্তু মিলিবে না শক্ত-মানুষ। অথচ আজ এই জাতীয় সমস্যা-সমাধানে—যেখানে যুগব্যাপী সাধনার প্রয়োজন, যেখানে তিলে তিলে বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়াই লক্ষ্যে আগাইতে হইবে, সেখানে চাই শক্ত-মানুষ। আমাদের পচা সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মজীবনের মধ্যে তাজা প্রাণবস্তুটি ফিরাইয়া আনিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন এই শক্ত-মানুষের—যে টলে না, গলে না,

ভোলেও না ;—যে নমে না, নামে না, থামেও না, অবশ্যম্ভাবী হইলে ভাঙ্গে।

শান্ত, শিষ্ট, বুদ্ধিমান, বিবেচক আমরা তোড়জোর বাঁধিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করি, কিন্তু সেই একটা পথ ধরিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারি না; এই পথের শেষ পর্য্যন্ত যাওয়ার পূর্ব্বেই, পাছে ভুল করিয়া বসি, এই আশঙ্কায় পথ বদলাই। কিন্তু একদিন তুমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহার সত্যাসত্যের পরীক্ষাটি তোমার সমগ্র জীবন দিয়াই করিতে হইবে। সত্যের ও পথের প্রেরণা যদি তুমি অন্তর হইতে পাইতে, তোমার সমগ্র জীবন যদি সেই সত্যটিকে সাব্যস্ত করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিত, তবেই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজের অন্তর হইতেই পথে চলিবার তাগিদ আসিত, বাহির-নিরপেক্ষ হইয়া যাত্রা করিবার দুর্জ্জয় আত্ম-বিশ্বাস দেখা দিত। পথ ও পাথেয় বিষয়ে তেমন একৈকনিষ্ঠা আজ চাই। না হয়, একটা জীবন ঐ পথেই—হউক না তা ভুল পথ—নিঃশেষ হউক। যদি তেমন ভাবে নিঃশেষই হইয়া যায়, মনেও করিও না তাহা ব্যর্থ হইবে; কারণ, ঐ পথটি ভুল হইলেও, তোমার মধ্যে যে শক্ত-মানুষটি গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইবে আমার জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—যে সম্পদ্ সত্যই আজ আমার জাতির নাই।

এমনই শক্ত-মানুষ আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে, পুরাণ যুগে দেখি। কত বড় তাঁহাদের প্রাণ। কি শক্ত, কত বড়

কলিজা। এক একটা মানুষ, আদর্শের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বিরুদ্ধ শক্তিকে যেন স্পর্দ্ধায় আহ্বান করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তবু নোয়ায় নাই। কত বড় বিরাট্ ব্যক্তিত্ব—ভগবানকে যেন স্পর্দ্ধায় আহ্বান করিতেছে। আজি আমাদের মনে হয়, বড় একগুঁয়ে এঁরা; একটা কথার, মতের আদর্শের জন্য কি কঠোর, কি শক্ত সাধনা ইঁহারা করিয়াছেন; কাহাকেও রেহাই করেন নাই—রেহাই দেন নাই—ভগবানকেও না। স্ত্রীজাতির অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবে না, এই ত কথা, তাই শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলে,—প্রাণটা দিলে! কর্ণ, কোথাও কি আপোষ করিতে পারিলে না, অতিথি-সংকার, এই একটা কথার জন্য—খেয়ালের জন্য—প্রাণাধিক পুত্রের মুণ্ড কাটিয়া দিলে, চোখের জল গড়াইল না! কোন ফাঁক খুঁজিলে না? ঐ শক্ত পথ হইতে বাহির হইবার কোন কৌশল-বুদ্ধি খাটাইলে না? সেক্সপিয়ার ত রক্তের ফাঁক বাহির করিয়া মাংস দেওয়ার দায় হইতে নায়ককে মুক্তি দিলেন, তুমি কোনও ফাঁক খুঁজিলে না! হরিশ্চন্দ্র, রাজ্য বিলাইয়া দিলে—তার পর তিলে তিলে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরীক্ষা চলিল; উঃ, কি সে কঠোর, না, অমানুষ! বিশ্বামিত্র, তুমি ঋষি, কিন্তু একি কঠোর! কড়ায় ক্রান্তিতে সব পাওয়া চাই—দেওয়া চাই!—এত শাস্তি, কোথাও কি আপোষ চলে না?—না, চলে না; সে যুগে চলে নাই। ঐ সব বীর একনিষ্ঠ সাধকদের নিজের বুকে ছিল বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাস,

নিজের মতে, নিজের পথে ছিল তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধা, অচল নিষ্ঠা, তাঁহারা ছিলেন শক্তির মালিক—শক্ত-মানুষ। কিন্তু তাহার পর সে মানুষ লুকাইয়াছে। আধুনিক ভারতের বাঙ্গলার কথাই ধরা যাউক। বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যে এবং আধুনিক সাহিত্যে তেমন মানুষের খোঁজ নাই। প্রাচীন সাহিত্যে দেখি, মস্ত বীর মস্ত যোদ্ধা, কত তাঁর সাহস কত কি; কিন্তু হঠাৎ এক দৈব ঘটনায় একেবারে নায়ক বদলাইয়া গেলেন—বীরপুরুষ অন্তঃপুরে গিয়া কাঁদিতে বসিলেন। কি সে বিলাপ, কি প্রলাপ; নায়ককে দেখিয়া কল্পনাও করা যায় না যে, তিনিই একদিন বীর ছিলেন, যোদ্ধা ছিলেন, পুরুষের মতই পুরুষ ছিলেন, একটা মানুষ ছিলেন। তারপর কবির কাছে শোনা গেল, ঐ বীরপুরুষের, অমন যে মানুষের মত মানুষ ছিলেন তাঁহার, সহায় ছিলেন এক ভৈরবী বা চণ্ডিকা দেবী অথবা এক পুরাধিষ্ঠাতৃ মহাদেবী! তিনিই হঠাৎ কোন কারণে বিরূপ হইয়াছেন তাই, একের অভাব—তাই এ ভাব। আমাদের আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যেও তেমন শক্ত-মানুষ—যে ভাঙ্গিলেও নোয়ায় না, নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমায় মহিমান্বিত—সৃষ্টি হয় নাই। এমন কি, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেও তেমন একটা শক্ত-মানুষ দেখি না, অন্যত্রও তাহাই। কোথাও বা দেখি নায়কের সংস্কার, বিশ্বাস একটা বড় নৈতিক বক্তৃতায় বা একজন সাধুর উপদেশে এক দিনেই বদলাইয়া গেল, তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ হইয়া আমাদের আদর্শ

নায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন! এমন করিয়াই সাহিত্যের মধ্যেও আমাদের ধারণা ও চরিত্র অনুযায়ী অপৌরুষ ভালমানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, শক্ত-মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। ভালমানুষটি তৈরী করাই চাই, ইহাই যেন লক্ষ্য; নীতিশাস্ত্রে যত বাধা-নিষেধ আছে, তাহার গণ্ডীর বাহিরে ফেলিয়া তাহাকে নির্দ্দোষ ভালমানুষটি করিতেই হইবে। কাহারও কথায় কাণ দিবে না, সমস্ত বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিবে, স্নেহের টানে গলিবে না, অভিজ্ঞ বিবেচকদের হিসেবী শাসনে টলিবে না, কেবল নিজের মতে নিজের পথে চলিবার দুর্জ্জয় জিদ্—এ যে বাপু নিছক একগুঁয়েমী;—এরূপ চরিত্র-চিত্রণ, অন্ততঃ আমাদের এই মেয়েলী দেশে, আদর্শ পুরুষ বা নায়ক হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না! বিভিন্ন আদর্শের সঙ্গে আপোষ করিতে না পারিলে সর্ব্ব-আদর্শ-সমন্বয় কেমন করিয়া হইবে? সমন্বয়, সামঞ্জস্য-সাধন কি একরোখা একগুঁয়েদের দ্বারা হয়!

জাতীয় জীবনে এই দুর্ব্বলচিত্ততা আজ একান্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে—এই সব নরম-মানুষ, মাটির মানুষই আদর্শ মানুষ বলিয়া চলিতেছে। ফলে, ভাল মানুষ সমাজে আজ পাইলেও শক্ত-মানুষ পাই না। তাই, জাতীয় জীবনে শক্তির খেলা বড় নাই। ভিক্টর্ হুগোর অঙ্কিত একটি চরিত্রই লক্ষ্য কর। তাঁহার 'সিমর্দ্যাঁ'র মত মানুষ আমাদের সাহিত্যে, সমাজে দৃষ্ট হয় না। এত কঠোর, uncompromising, একনিষ্ঠ, অটল, ভীষণ কর্ত্তব্যপরায়ণ চরিত্র সৃষ্টি করিতে আমাদের আধুনিক

সাহিত্যিকরা সঙ্কুচিত হইতেন। এত বাড়া-বাড়ি কি করা যায়! মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলির জয় সিদ্ধ করিতে না পারিলে সভ্যতা সূক্ষ্ম, চারু, সুন্দর 'আদর্শ'মাফিক হইল কৈ? 'সিমরদাঁা'কে সমর্থন না করিতে পারি, কিন্তু ঐ যে শক্ত-মানুষটা ওখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, ওখানে মাঁথা না নোয়াইয়াও ত পারি না। আর সত্য কথা বলিতে কি, জাতির মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য ঐ রকম কতগুলি শক্ত-মানুষই আনিয়া দেয়। সহস্র সহস্র 'ভালো ছেলের' দল হইতে, ভ্রান্ত হইলেও ঐ দৃঢ় কঠোর শক্ত মানুষগুলিই জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করে।

যে আমরা যখন তখন মত বদলাই—কেবলই ভুল শোধরাইয়া নিষ্কলঙ্ক ভাল মানুষটি হইতে চাই, হয়ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল—হয়ত কে কি ভাবিতেছে এই আশঙ্কায় আজিকাব মত কালপর্য্যন্ত বজায় রাখিতে ভরসা হয় না—সেই আমাদের কাছে শক্ত-মানুষের আদর্শ ফিরাইয়া না আনিলে চলিবে না। মানিলাম, তুমি ভুল দেখিলেই পথ ও মত বদলাইয়াছ, ভ্রান্তিব ইঙ্গিতমাত্রেই সত্যের দিকে ফিরিতে গতি বদলাইয়াছ, কিন্তু কি হইবে ঐ মতে আর পথে, যদি শক্ত-মানুষের অপরাজেয় শক্তিতে তুমি মত ও পথকে সত্য করিয়া তুলিতে না পার?

জাতির মধ্যে এই শক্ত-মানুষের চেতনাটি তেমন ভাবে আজ আর নাই,—আর নাই বলিয়াই বাঙ্গলার এমন যে সাহিত্য, তাহার মধ্যেও তাহার সন্ধান মিলে না।

শক্ত-মানুষ

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'-সৃষ্টি অপূর্ব্ব। প্রথমটা মনে হইয়াছিল, এই বুঝি একটা শক্ত-মানুষ সৃষ্ট হইল! কিন্তু যে কথা জাতিব সেই কথাই ত কবির। তাই যেন শেষে দেখিলাম, পাছে গোরা বিশ্রীরকমের একগুঁয়ে গোঁড়া হইয়া পড়ে, তাই যেন সে 'মিউটিনি'র কুড়ানো ছেলে হইয়া শুদ্ধ, শান্ত ভগবদ্ভক্ত হইল—ভারতের সাধনার সাধক হইয়া পড়িল; সেই উগ্র গোঁড়া গোরা একটি আঘাতে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার সাধক হইল, শান্ত পরেশের সুশান্ত শিষ্য হইল, সুচরিতার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া আমাদের আদর্শ শান্ত সভ্য নায়ক হইয়া উঠিল;—কিন্তু সেই একগুঁয়ে, গোঁড়া, অটল, 'অসভ্য' শক্ত-মানুষটি আর রহিল না।

ভারতের আজিকার এই জাগরণকে জীবনের স্পর্শে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, এই হেলে পড়া, নুয়ে পড়া জাতির সমাজে রাষ্ট্রে প্রাণের সাড়া জাগাইতে হইলে, নির্জ্জীব ঘুমন্ত জাতিব চোখ জীবন্ত সৃষ্টির মহিমার দিকে ফিরাইতে হইলে আজ শক্ত-মানুষই চাই। শক্ত-মানুষের মধ্যে যে শক্তি আপন মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে, প্রয়োজন হইলে সৃষ্টি করিতে তাহাই পারে, জাতির গড্ডলিকাপ্রবাহ সে-ই থামাইতে পারে, জাতির অবসাদ অঙ্গে গতিবেগের ধাক্কা সে-ই দিতে পারে, আত্ম-বিস্মৃতির অহিফেন নেশার চোখে সে-ই চমক্ লাগাইতে পারে,—কেবল নির্ভুল নরম অ-শক্ত ভাল মানুষটি তাহা পারে না। তাই, শক্ত-মানুষই সমাজে আজ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কারণ সমস্ত থাকিতেও আমরা যে শক্ত নই, সুতরাং শক্তি আমাদের সার্থক হইতে পারিল না—পঙ্গু হইয়াই রহিল, জাতির মুক্তির পথে ইহাই না আজ বড় বাধা ? ভারতের দাবী অপ্রতিহত করিতে প্রবুদ্ধ ভারতের চাই কতগুলি শক্ত-মানুষ।

গণ-শক্তি

গণ-তন্ত্রের কথা উঠিয়াছে, কিন্তু জন কৈ? যাহাদের বন্ধন ঘুচাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহারা প্রভু হইতে চায় কৈ? যাহাদের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার ডাক আসিয়াছে, তাহারাই পরের পায়ে লুটাইয়া পড়িতে ভালবাসে, এই ব্যাধির প্রতিকার কৈ? কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়াও এই সত্য ত পাইল না যে, লড়াই কেবল কারখানার মালিকের সঙ্গে নহে, তাহার লড়াই চালাইতে হইবে আপনারই কুলি-বুদ্ধি, দাসত্বের চেতনার সঙ্গে। কুলি আজ strike করিয়া মালিকের বিরুদ্ধে তাহার যে অভিযোগ মালিকের কাছেই তাহা জানায়; কুলির চেতনাই সেখানে বড় হইয়া আছে, মালিক হইবার চেতনা নাই—মালিক হইতে সে চাহে না। এই ব্যাধির প্রতিকার কি? গণ-তন্ত্রের 'গণ' কৈ? গণ আজ গণপতিকেই চাহে। তাহার জয় গাহিয়াই নিজের পরাজয় ভুলিতে চাহে। তাই মুক্তি চাই; 'মুক্তি দাও' বলিয়াও মুক্তির যথার্থ স্বরূপ আমাদের জন-সাধারণকে পাগল করিল না।

সমগ্র জগৎ আজ মুক্তিকামী! যুগ যুগান্তের পরাধীনতার অসহ্য বেদনা আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, নানা মূর্ত্তিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে একই সময়ে ডাকিয়া উঠিয়াছে, 'মুক্তি' 'মুক্তি'—মুক্তি চাই! পুরাতন বন্ধনের সমস্ত বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, জনশক্তি মুক্তির বনিয়াদের উপর সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়

বদ্ধপরিকর। জগদ্ব্যাপী এই বিপুল মুক্তি-সংগ্রামে ভারতও এক পাশে দাঁড়াইতে চায়। এই ভাব-বন্যার প্লাবন ভারতের মাটিতেও ধাক্কা লাগাইয়াছে। 'এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?' ভারতের তথা জগতের ভাগ্য-বিধাতা ভগবান্ জগতের সঙ্গে ভারতকেও কবে কেমন করিয়া সর্ব্বদিকে যুক্ত করিয়া দিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

কিন্তু ভারতের মত ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ব্যষ্টিতে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, আর কোন জাতি এমন করিয়া জাতীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নাই। কারণ, জাতির জন-শক্তির যেখানে খোঁজ নাই জাতীয়জীবনের খোঁজ সেখানে কেমন করিয়া মিলিবে ?

জগতের প্রতিভাই জগতকে শাসন করিতেছে—কতকাল করিবে কে জানে। প্রতিভা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, অর্থ ও শূদ্র-শক্তিকে সহায় করিয়া শূদ্রকে বা সাধারণ জনশক্তিকে শাসন করিতেছে। প্রতিভা যে ক্ষাত্র-শক্তি বা সামবিক-শক্তি আজ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতেও শূদ্র-শক্তিই তাহার সহায় ! কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড এই শূদ্র-শক্তিকেই শাসন ও শোষণ করিয়া, প্রতিভা অর্থ বা বৈশ্যের দ্বারেই আজ আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে ! জগতের যাবতীয় তন্ত্রের ভিতবকার রহস্যই ত ইহাই। হায় রে বুদ্ধি-প্রতিভা !

অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রতিভার সঙ্গে হৃদয় আসিয়া এই শূদ্র-শক্তির ব্যথায় কাঁদিয়াছে এবং সাময়িক ভাবে কতকটা জয়লাভও

করিয়াছে। ঐ চির-নির্য্যাতিত শূদ্র-শক্তিকে তাহার সুপ্ত দেবতার সন্ধান দেখাইয়া তাহাকে বুঝাইয়াছে, তুমি ক্ষুদ্র নহ, সকলের মূল তুমি, তুমি জাগিয়া উঠ। ওরে চিরবুভুক্ষু! একবার জাগিয়া বিশ্ব ভোগ কর। জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হউক; মৈত্রী ও স্বাধীনতা সাথে সাথেই আসিবে। কিন্তু হায়! যে পরমুখাপেক্ষী, পর আজ্ঞাবহ, হুকুম তামিল করিতেই যে চির-অভ্যস্ত, স্বাধীন চিন্তা যে জীবন ভরিয়াই করিল না, সে আজ কেমন করিয়া আত্মবশ হইবে? আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে? হায়, দুই দিনও ত গেল না প্রতিভা আসিয়া, অর্থ ও শূদ্র-শক্তিকে সহায় করিয়াই আবার প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল! জনশক্তি যে তিমিরে সে তিমিরে; মুক্তির আস্বাদ সে পাইল না। ব্যভিচারী সেই প্রভুশক্তি জনসাধারণের জন্মভূমি লইয়াও কত সময় স্বার্থের খেলা খেলিয়াছে। বিদেশীর হস্তে তাহাদেরই স্বদেশ তাহাদেরই সহায়তায় তুলিয়া দিয়াছে; কি যে দিল, কোন্ অমূল্য রত্ন কিসের বিনিময়ে যে বিকাইয়া আসিল, সেই খবরও সে দুর্ভাগারা রাখে নাই! তাহার পর এই জনশক্তি মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাও ক্ষিপ্ত হইবার কারণ এ নহে যে, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে আজ পঙ্গু, পঙ্গুত্বের বেদনা তাহার অসহ্য হইয়াছে; তাহার কারণ, অনাহারে আর থাকিতে পারে না। শিক্ষা চাহে নাই, সভ্যতা চাহে নাই, ধর্ম্ম চাহে নাই, চাহিয়াছে,—শুধু এক মুষ্টি অন্ন। প্রকৃতি যে অভুক্তের মধ্যেও ক্রীড়া করে। প্রভুশক্তি

তাহার শাসনযন্ত্রকে বাহিরে অব্যাহত রাখিতে, হিসাব-নিকাশ করিয়া সেইবারের মত জনশক্তিকে কিছু আহার্য্য প্রদান করিয়া বলিয়াছে—এই নাও, শান্ত হও! আইন-কানুন মানিয়া চল, নতুবা মারা পড়িবে! জনশক্তি তাহাতেই তুষ্ট হইয়া আবার হুকুম তামিল করিল। পুনঃ পুনঃ ইহাই ঘটিতে লাগিল। কিন্তু এ ত হয় না। প্রতিভার এই ব্যভিচার প্রকৃতি সহিতে পারে না। কতকাল সহিবে? তাই জগতের সকল রাজতন্ত্রে, প্রজাতন্ত্রে, যাবতীয় তন্ত্রেই আজ এক বে-সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। আজ কেবল মাত্র একটু আরাম, সুখ-সোয়াস্তি নহে, আরো মূলে যাইতে হইবে; সুশাসন মাত্র নহে স্ব-শাসন; patchwork নহে, মানুষকে মানুষ বলিয়া মুক্তির সকলখানি সম্মান ও দায়িত্ব দিতে হইবে, নিতেও হইবে। তাই, এক মুষ্টি অন্নই শুধু নহে, জনসাধারণের সর্ব্ববিষয়ে মুক্তি লাভ করা চাই। কোন শ্রেণীবিশেষ নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, সকলের সমভাবে এই সাধারণতন্ত্রে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সকলের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন গবেষণা অব্যাহত রাখিতে হইবে। মনের মুক্তি, দেহের মুক্তি, আত্মার মুক্তি, এক সঙ্গেই চাই। এ ত গেল ব্যষ্টির কথা। তাহার পর রাষ্ট্র বুঝিয়াছে, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে হইলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে—মানুষ হওয়ার পক্ষে কোন বাধাই কোথাও রাখা যাইবে না। জনশক্তি যেখানে উন্নত, শিক্ষিত, সভ্য ও সর্ব্বোপরি সজাগ ও দায়িত্ব-

জ্ঞানসম্পন্ন, সেই রাষ্ট্রই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিজয়ী। তাই প্রতিভার উপরই কেবল সমস্ত দায়িত্ব না রাখিয়া জনশক্তি আজ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহে; আজ প্রতিভার নিয়ন্তা হইবার স্পর্দ্ধা সে রাখে। কৃতকার্য্য হউক না হউক, তাহাতে করিয়াই জনশক্তি আজ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিতেছে। ভারতের জনশক্তি কিন্তু আরো পিছনে। জগতের জনগণের স্বাধিকার-প্রমত্ত ভাবও তাহার নাই, দায়িত্ব-বোধের গৌরবও তাহার নাই।

তবে, ভারতের জনশক্তিও আজ অনেকটা ক্ষুধার তাড়নায়, আর কতকটা বিশ্বজনীন এই মুক্তির আবহাওয়ায় 'জাগিয়া' উঠিয়াছে। জনসাধারণের এই জাগিবার চেষ্টাই ভারতে শক্তিশালী 'নেশন' প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিবে। যাক্ সে কথা।

চিত্তরঞ্জন একদিন বলিয়াছিলেন, 'যখন দেখ্‌বো যুবকেরা দলে দলে, গ্রামে গ্রামে, কৃষকের পরাধীনতার শৃঙ্খল যাতে ছুটে যায় তার চেষ্টা কর্‌ছেন, তখনই বুঝ্‌বো আপনারা স্বরাজ চান। মহাত্মা গান্ধীর জয়? মহাত্মা কে? তিনি একজন অসাধারণ মানুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারত কি একজনের জয় চায়? ভারত চায় ভারতের জয়।' সত্যই, ভারত ভারতের জয়ই চাহে।

এই ভারতের জয়ের কথাই আজ ভারতকে বুঝিতে হইবে। আত্মবিস্মৃত জাতি তবেই ত বুঝিবে কত বড় শক্তি, জাতির

অন্তরের কুক্ষিতে আত্মগোপন করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল! যে শৌর্য্য-বীর্য্য থাকিলে, যে জ্ঞান ও সভ্যতার অধিকারী হইলে, একটা জাতি বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে, ব্যক্তি হিসাবে তাহা আমাদের ছিল। একজন হিন্দু একজন বিদেশী যোদ্ধা হইতে বীরত্বে ন্যূন ছিল না। কিন্তু হিন্দুর ছিল না আত্মপ্রত্যয়, ছিল না দায়িত্বের চেতনা। পঞ্চনদে পুরু থাকিলে, সম্মুখে দাঁড়াইলে যে হিন্দু-সাধারণ অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছে, পুরু সরিয়া পড়িলে গ্রীক্ সেনার সম্মুখে দাঁড়াইবার সামর্থ্য, কি হিন্দুত্বের চেতনা, কি স্বদেশ—স্বাধীনতার চেতনা—তাহাকে আনিয়া দিতে পারে নাই। যেন পুরুর জন্যই তাহারা লড়িয়াছে, নিজের জন্য নহে। পুরু জয়শ্রী লাভ করিলেই তাহাদের আনন্দ। পুরুই যদি গেল, তাহা হইলে দেশের মালিক হিন্দু কি যবন হইল, তাহাতে কি আসিয়া যায়। 'স্বাধীনতা', আমরা যাহাকে আজ স্বাধীনতা বুঝিতেছি, সেই স্বাধীনতা হইতে এই দুর্ভাগ্য দেশ যে কত শতাব্দী যাবৎ বঞ্চিত রহিয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে! রাষ্ট্রশক্তির সহিত ব্যষ্টি-সাধারণ এখানে যুক্ত হইয়া থাকে নাই। রাষ্ট্র লইয়া জনকয় লোক ক্রীড়া করিয়াছে, জন-সাধারণের কোনও চেতনা এখানে সার্থক হইতে পারে নাই। তাহারা আলোর বা অন্ধকারের তারতম্য কিছু বুঝে নাই। বুঝে নাই, তাই জাতীয় শক্তি হিসাবে ভারত এখানে অতি দুর্ব্বল। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিশ্বে সে এই জন্যই দাঁড়াইতে

পারিল না। বহু মনীষী মহাপুরুষের আবির্ভাবেও তাহার জাতীয় জীবনের তমিস্রা দূরীভূত হয় নাই। এত বড় বিরাট্ জাতির দীর্ঘকালব্যাপী পরবশ থাকিবার মূল কারণ জনসাধারণের এই উদাসীনতা ও সর্ব্ববিষয়ে দায়িত্বহীনতা। যেমন ধর্ম্মজীবনে, তেমনি কর্ম্মজীবনে তাহারা কোন মুক্তির আস্বাদই পাইল না, পাইতে চাহিল না। জীবনের পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুই তাহাকে মানুষ হইতে দেয় নাই। জাতির পাওনা-দেনা, ভাঙ্গা-গড়ার কোন ব্যাপারেই তাহার মঙ্গলহস্ত ক্রীড়া করে নাই। ফলে, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে বরাবরই সে হটিয়াছে। ধর্ম্মজীবনে শিব, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের জয়োচ্চারণ করিয়াও, তাই জাতি হিসাবে কেবল পরাজয়কেই সে লাভ করিয়াছে। ভিতরের দেবত্বকে, মনুষ্যত্বকে না জাগাইয়া কেবল দেবতার উপর নির্ভরতায় ও তাঁহাব জয়োচ্চারণে দেবতা তুষ্ট হইবেন কেন? ফলে, দেবতারা যেন রুষ্ট হইয়াই জাতির ভাগ্যে কাঠ পাথর হইয়াই রহিল, তাহাতে জাতির আত্মদেবতা তুষ্ট হইল না। কর্ম্মজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনেও সেই দাসত্ব। কয়দিন 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' চীৎকার করিলাম। আবার তাহাতেই আনন্দ! কিন্তু তাহাতে আমাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার পর ইংরেজের হস্তে আমরাই এই দেশ তুলিয়া দিলাম। আলো অন্ধকারের তফাৎ তখনো বুঝি নাই। ইংরেজ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিল, কিন্তু তাহাতে আমাদের বুদ্ধি, প্রতিভা কিছুই যুক্ত হইয়া থাকে নাই, তাই সত্যকার জাতীয়-

সম্পদ্ হিসাবে আমরা তখনো কিছুই গড়িলাম না। সর্ব্ববিষয়ে জাতির এ পঙ্গুত্বই যে জাতীয় মৃত্যু, ভারতের চিন্তাশীল হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গীন্ মুক্তি আজ চাই! গোটা জাতিকে আজ মুক্তির স্পর্শ দিতে হইবে। দাস আজ প্রভু হইবে। পরবশ আজ আত্মবশে প্রতিষ্ঠ হইবে। আজ কথায়-কার্য্যে, চিন্তায়-আত্মায় 'স্বরাট্' হইবে। ভারতে 'নেশন' প্রতিষ্ঠার কথা, ত্রিশকোটি লোকের স্বাধীন সত্বা ফিরিয়া পাইবার কথা সর্ব্বাঙ্গীন্ মুক্তির দিক দিয়াই প্রবুদ্ধ ভারতকে আজ ভাবিতে হইবে। 'গণ-তন্ত্র', 'সাধারণতন্ত্র' কথাগুলি আমাদের জাতির কাছে নিছক প্রহসন। আমাদের দেশের জনসাধারণের, আত্মবিস্মৃতির মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে না পারিলে ভারতের জনসাধারণ কখনো তাহাদের নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইবে না, 'স্বরাজ' পাইলেও হইবে না, 'অটনমী' পাইলেও হইবে না। জনসাধারণের পরনির্ভরশীলতা,—তা' সে মহাত্মার উপরেই হউক, বা কোন দেবতা, উপদেবতা অথবা অবতারের উপরেই হউক, দূর করিতে না পারিলে জাতির আত্মনির্ভরশীলতা আসিবে না। লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, জাতি যতই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছে, জাতির ঘরে ঘরে অবতারের আবির্ভাব ততই সম্ভব হইতেছে। ধর্ম্মে—রাষ্ট্রে, সমাজে, কোনও রকমে জাতি যদি কাহারো উপরে বোঝা চাপাইতে পারে, কাহাকেও যদি পারের কাণ্ডারী করিতে পারে, কাহারো স্কন্ধে নিজের ভালমন্দের সবখানি ভার দিয়া

যদি দায়-মুক্ত হইতে পারে, তবে যেন বাঁচিয়া যায়। এমন জাতির স্বরাজের অর্থ কিছু নাই। যে নিজেই প্রতিষ্ঠ নহে, তাহার স্বরাজ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে? এই যে আজ মুক্তির সংগ্রাম, এখানেও জনসাধারণের মুক্তির চেতনা কৈ? মহাত্মা গান্ধী চাহিলেন অভাগাদের মুক্ত করিতে, তাহারা মহাত্মাকে অবতার ঠাওরাইয়া পূজা সুরু করিয়া দিল; মহাত্মা দিতে চাহিলেন শক্তি, অভাগারা মহাত্মাকেই সকল শক্তির মালিক ভাবিয়া নিজেরা শক্তির সন্ধান করিল না। ভারতের জনসাধারণ মহাত্মাকে অতি সহজেই অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের নিজের ব্রহ্মসত্বাকে জাগাইবার চেষ্টা করে নাই, উহার অভাবে তাহাদের বেদনা-বোধও নাই। সহস্র অবতারের পরে আর একটি অবতারের অবতারণা করিয়া তাহাকে ভক্তি করিয়াছে, তাহার জয় কামনা করিয়াছে, কিন্তু নিজেদের শক্তির কথা—জয়ের কথা বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। সেদিনে শোনা গিয়াছে, 'গান্ধী মহারাজ কালীমায়িকী অবতার।" শিক্ষিত হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এই বলিয়া লড়াই হইতে দেখিয়াছি যে, মহাত্মাজী বড় অবতার না রামজী বড় অবতার। ব্যারিষ্টারের মুখে পর্য্যন্ত মহাত্মার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের কথা বাহির হইয়াছে; ঐ অলৌকিকত্বের উপরেই তাহার ভরসা প্রকাশ পাইয়াছে। অবতার বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রমাণ করিতে পারিলেই যেন সবার দায়িত্ব চুকিল, তাতেই আনন্দ! নিজেরা

কতখানি কি পাইয়াছে, নিজেদের দায়িত্ব কোথায়, তাহার কতটা গৃহীত প্রতিপালিত হইয়াছে—সেই হিসাব নাই। আর এই হিসাবও নাই যে, সহস্র অবতারের পূজা করিয়াও আমরা মানুষ হইতে কেন পারি নাই। পারি নাই, কারণ মানুষ হইবার আমাদের প্রয়োজনই হয় নাই। জাতি, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের উপর আমাদের স্বীয় দায়িত্ব যে রাখি নাই। সকল ভারই দৈব, অবতার, গুরু, রাজার উপরই দিয়া রাখিয়াছি। জনসাধারণের সেই পরনির্ভরতা আজিকার এই জাগরণকেও ব্যর্থ করিয়া দিবে। শক্তির বেদীতে 'নেশন' প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব হইবে না, যদি ভারতের জনসাধারণ একান্ত করিয়া না বুঝে যে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবার মালিক সে, আর কেহ নাই—তাহার বোঝা তাহাকেই বহিতে হইবে, ভগবান্, অবতার, গুরু, নেতা, এমন কি, রামরাজত্বের রামচন্দ্রও তাহা বহিবে না—বহিতে পারে না; তাহার বাঁচা-মরার জীওনকাঠি মরণকাঠি তাহারই হাতে, আর কাহারো হাতেই নহে, ইংরেজ ব্যুরোক্রেসীর হাতে নহে, কালা ব্যুরোক্রেসীর হাতে নহে। তাহার স্বরাজ অর্থ তাহারই 'স্ব-রাজ'—তাহা রামরাজত্ব নহে আমলাতন্ত্রীরাজ নহে, জমীদারের রাজ নহে, বাবুর রাজ নহে; তাহা তাহারই রাজ—ঐ রাজে তাহার প্রভুবুদ্ধি যুক্ত হওয়া চাই,—ঐ রাজের ভাঙ্গা-গড়ার দায়িত্ব তাহাকেই বহিতে হইবে। আর তাহা না করিয়া যদি সেই সনাতন পরনির্ভরতাই জিয়াইয়া রাখ, আর সেই দৈব ও অবতারের উপরেই সব ভার দিতে চাহ,

তাহা হইলে ভারতের আর যেখানেই আলো জ্বলুক, তোমার কুটিরে আলো জ্বলিবে না; তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।—আর যত বড় অবতারের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাক, যত জোরেই জয়ধ্বনি কর, দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় বলিতে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণ বাঁকা হইয়া পটেই আঁকা থাকিবেন—' আর আমাদের, 'নিয়েছি শরণ মোগল-দেবের চরণ-তলায়' ছাড়া আর গতি নাই। ভারতের প্রবুদ্ধ বুদ্ধি, ভারতের জনসাধারণের মনের দাসত্ব দূর করিতে তাহাদের আত্ম-সম্বিৎ জাগাও, আত্মনিয়ন্ত্রনের, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা আনিয়া দাও।

যে ভারতের কোটী কোটী লোক শত শত বৎসর ধরিয়া ঘরে বাহিরে পরবশ, পরবশেই যাহার তৃপ্তি, আরাম, সেই জাতি আজ স্ববশ হইবে, স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া—স্বীয় চেতনায় জাতির মুক্তিকে গড়িয়া আনিবে—ইহাই ত ভারতের বর্ত্তমান জাগরণের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ কথা। কোটী কোটী লোক ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে কেবলই ditto দিয়া, হুকুম তামিল করিয়া প্রভু মানিয়াই এমন দুশ্ছেদ্য জাতি-বিধ্বংসী পরাধীনতার নাগপাশে এই বিপুল জন-সমষ্টিকে অন্তরে বাহিরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এই জনসাধারণের আত্ম-চেতনাকে ফিরাইয়া আনা তাহাদের সজাগ, দায়ীত্বসম্পন্ন করাই আজিকার দিনের শ্রেষ্ঠ কথা। সেই জাগরণের মহিমায়-ই ভারতে সত্যকার 'নেশন' প্রতিষ্ঠা হইবে। জনসাধারণের নির্লিপ্ততা, অজ্ঞতা,

দায়িত্বগ্রহণে পরাঙ্মুখতার জন্য কখনও মোগল, কখনও পাঠান, কখনও ইংরাজ আসিয়া আমাদের বাঁচা-মরার ভার লইয়াছে; যে লুপ্ত-চেতনার জন্য জনকয় লোক রাষ্ট্র ও সমাজ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছে, সেই পথে আর নয়, জাতিকে সেই আরামের পথে, কেবলমাত্র প্রভু মানিয়া চলিবার পথে, যাইতে দিলে আবার সেই স্বখাতসলিলেই ডুবিতে হইবে। নবীন ভারত সেই পথকে পরিহার করিয়াই চলিবে।

সাম্প্রদায়িকতা

বনাম

জাতীয়তা

সমগ্র জগৎ যখন শক্তির শুল্কে সত্যকে সাব্যস্ত করিয়াই নিজস্ব করিয়া লইল, আমরা তখন শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া সত্যের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। জাতীয়জীবনের হিসাবের খাতায় তাই ফাঁকির অঙ্কই জমিয়াছে—খাঁটির আঁক পড়ে নাই। মানুষ পরকে বঞ্চনা করে, কিন্তু এই জাতির মত এমন আত্ম-বঞ্চনা আর কোথাও কোন জাতি করে নাই। কোথাও ভুল বুঝিবার উপায় থাকিলে এ জাতি সত্যটা বুঝিতে চাহে নাই, কোন প্রকারে সমস্যাকে এড়াইয়া আসিতে পারিলে, এ জাতি আর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালায় নাই, শাস্ত্রবাক্যে, ঘোষণাবাণীতে বস্তুর সন্ধান পাইলে কর্ম্মসূত্রে আর তাহা সাব্যস্ত করিয়া নিজস্ব করিতে চাহে নাই।

যে জাতি ঘুমাইতেই চাহে তাহাকে জাগানো বস্তুতঃই শক্ত। যে জাতি আজিও মার খাইয়া শক্তির সন্ধান করে না, কিন্তু সংবাদপত্রে ঐ মার খাওয়ার সংবাদ পত্রস্থ করিয়া—ফটো ছাপাইয়া—মারের বেদনা ভুলিতে চাহে, তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইবে কে? জার্ম্মান-পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, ইংরেজ

ভারতবর্ষে গিয়া ভারতবাসীদের সম্মুখে বাইবেল ও আফিম আগাইয়া দিল, ভারতবাসী একটু চোখ মেলিয়া বাইবেল ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল কিন্তু অহিফেনের কৌটা রাখিয়া দিল। কথাটা যে ভাবেই উক্ত হউক, ভারতবাসী সেই অহিফেন সেবন করিয়াছে, বটেই, যে অহিফেনে তাহার 'আত্মসম্বিতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

যে সকল ভারতবাসী পুরাণো সংস্কৃতচর্চ্চা চালাইলেন, তাঁহাদের ত চোখ ফুটিলই না—যাঁহারা ইংরেজীর চর্চ্চা করিলেন তাঁহাদেরও চোখ ফুটিল না। ইংরেজী শিখিয়া ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে নিজেদের তফাৎ বুঝিল কিন্তু তফাৎ কোথায়, কেন,—কেমন করিয়া তাহা দূর হইবে, তাহা বুঝিল না। তাই 'ভারতীয় স্যাণ্ডোর' মত, ভারতীয় ম্যাগনাকার্টার (Indian Magnacharta) সন্ধান পাইয়া আশ্বস্ত হইল। আর কি, সবই হইয়াছে! কিন্তু হায় রে ভারতীয় ম্যাগনাকার্টা! লর্ড কার্জ্জন সে দিন সত্য কথা বলিয়াছিলেন, ওসব বাজে—যা হয় না অসম্ভব, সেই সব কথা ওখানে লেখা আছে। লর্ড কার্জ্জনের কথা অতি সত্য, শক্তিশালী জাতিরই লোক, ম্যাগনাকার্টা কাহাকে বলে তাহা ভাল করিয়াই জানেন। আমরাও জানিতাম, কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে বস্তুর বর্ণনা করিতে পারিলে কর্ম্মসূত্রে ত তাহা আমরা পাইতে চাহি নাই। ইংরেজ-জাতি ম্যাগনাকার্টা পাইয়াছিল, তাহা কোন কার্জ্জনই আজ পর্য্যন্তও অসম্ভব বলিয়া ফেলিয়া

দিতে ভরসা পান নাই। ও তো কারো দান নহে। ও হইল সমগ্র ইংরেজ-জাতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাতীয়জীবনের সম্মিলিত সৃজন। সমগ্র জাতি শক্তির শুল্কে আত্ম-নিয়ন্ত্রনকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কাগজের লেখাটুকু, শাস্ত্রবাক্যটুকু অবান্তর—না হইলেও জাতির শক্তির অর্জ্জন কারো মর্জ্জিতে আটকাইত না। সেই ম্যাগনাকার্টা, আর ভারতের ম্যাগনাকার্টা! একটা ইংরেজ-জাতির অর্জ্জিত; আর একটা অনুকম্পার দান। কিন্তু এ নিয়াই আমরা আত্মবঞ্চনা করিতে ছাড়ি নাই। এ যেন ইংরেজের মতই আমাদেরও সৃষ্ট—সুতরাং নিজস্ব। লর্ড কার্জ্জন শেষে এই চির-ভোলা জাতির ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। অন্যায় কিছু নহে, অনুকম্পায় যাহা দেওয়া যায় মর্জ্জি হইলে তাহা নেওয়া যায়, অগ্রাহ্য করা যায়। যাহা আমাদের নিজেদের গড়া নহে, যাহা জাতির স্ফূর্ত্ত শক্তিতে অর্জ্জিত নহে, তাহাতে—জাতির কোন ভরসা রাখা যে কত বড় ভুল—সত্যের দিক হইতে তাহা কত বড় মিথ্যা—সে কথা বুঝিতেই এই Magnachartaর কথা তুলিলাম। শুধু কি এই ভুল,—ভারতের মুসলমান একেবারে গোড়ায় ভুল করিয়া মুসলমানের মুক্তি চাহিতেছে। হিন্দু ভুল করিয়া লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের জোড়া-তালিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে, ফলে বাড়িতেছে জাতীয় সমস্যা। শাসক-জাতির ভেদনীতিই চরম ও পরম নীতি, আমরা সবাই মিলিয়া সেই নীতিকে জয়যুক্ত করিতে অধ্যবসায় দেখাইয়াছি।

অথচ মূলে যেখানে ভুল, সেই ভুল শোধরাইবার চেষ্টা নাই। যে জাতীয়তায় সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা মিটিতে পারে, সেই জাতীয়তার দেশাত্মবোধের কথা আমাদের কাছে বড় হইয়া উঠিল না। আমাদের ভারতীয় মুসলমানগণ ভারতের বাহিরেই তাঁহাদের জীবনের সূত্র খুঁজিলেন, হিন্দু অগত্যা প্যাক্টের মারফতে সেই বহির্মুখীন জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনের যোগ-সূত্র স্থাপনের আশা ও আশঙ্কা দুই-ই পোষণ করিলেন। উপায়? একান্ত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়গণ বুঝিয়াছেন, ওপথে হইবে না, হিন্দু-মুসলমানকে ভারতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। যেমন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান, পার্শী—তেমনি বাঙ্গালী, মারাঠি-পাঞ্জাবী-মান্দ্রাজী সকলকেই তাহার বিশিষ্টতার ও স্বাতন্ত্র্যের অর্ঘ্য ভারতের পায়েই নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতা তথা প্রাদেশিকতা-রূপ কুসংস্কার দেশাত্মবোধের অনাবিল স্রোত ধারায় ধুইয়া দিতেই হইবে। বুঝিতে হইবে,—(Patriotism is a correction of superstition and the more we feel for our country the less we feel for our sect. কুসংস্কার সংশোধিত হইয়া দেশ-প্রীতিতে পরিণত হয়। দেশকে যতই আমরা ভালবাসিতে পারিব, সাম্প্রদায়িকতা ততই কমিয়া যাইবে)

বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া আসিয়া—মর্ম্মদাহী জ্বালা হৃদয়ে বহিয়া প্রবুদ্ধ ভারত বুঝিয়াছে—হিন্দু-মুসলমানের মিলন

ব্যতিরেকে আমরা টিকিয়া থাকিতে পারিব না—বাঁচিবার আর পথ নাই। কিন্তু এই মিলন ঘটাইবে কে? এই মিলন ঘটাইবার একমাত্র উপায় 'দেশাত্মবোধ'। 'The more we feel for our country the less we feel for our sect.'

এইখানে বলিয়া রাখাই সঙ্গত, হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধ হয় নাই, এখনও হইতেছে না—ভবিষ্যতেও হইবে না। কোন 'ধর্ম্মের' সঙ্গেই কোন 'ধর্ম্মের' বিরোধ হয় না। হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ হইয়াছে তাহাও 'ধর্ম্ম' লইয়া হয় নাই—বিরোধ হইয়াছে 'অধর্ম্ম' লইয়া, সম্প্রদায় ও Sect লইয়া। হিন্দু এবং মুসলমান প্রকৃত ধর্ম্মহিসাবে বিরোধ করিবে না—কিন্তু বিরোধ করিয়াছে ও বিরোধ করিবে সম্প্রদায় লইয়া, Sect লইয়া—মিথ্যা ও কুসংস্কার লইয়া; সুতরাং তাহার প্রতিকার হইতেছে—দেশপ্রীতি। ভুলের বোঝা বহাই আমাদের ভাগ্য-লেখা, তাই নেতা ও বক্তার মুখে এমন কথাও শুনা যায়, আমি আগে মুসলমান পরে ভারতবাসী বা আগে হিন্দু পরে ভারতবাসী। একথাগুলি যে একেবারেই অশ্রদ্ধেয়, তাহা এই সকল শ্রদ্ধেয় নেতাদের মাথায় রাখিয়াও প্রবুদ্ধ ভারতকে বুঝিতেই হইবে। আগে আর পরে কি? তাঁহাদের আখ্যাত হিন্দু-মুসলমান কি সম্প্রদায়গত না ধর্ম্মগত? ধর্ম্মগত, হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের জন্মভূমি ভারতের স্বার্থের সঙ্গে কখনও কোন অবস্থায়ই (সত্যকার) বিরোধ উপস্থিত হইতে

পারে না, তা' আর আগে পরে কি ? বিরোধ যদি হয়, ত হইবে সম্প্রদায়গত, sect গত, হিন্দু বা মুসলমানের সঙ্গে ভারতে স্বার্থের বিরোধ। সেই সময় ঐ বিরোধের মীমাংসা করিবে আমাদের জাতীয়তা—আমাদের দেশাত্মবোধ! সেই জাতীযতার মূল ভিত্তি ভারতবাসীর একাত্মবোধ। সম্প্রদায়গত 'হিন্দু' 'মুসলমান' সংজ্ঞা ভুলিয়া 'ভারতবাসী' হইতে হইবে। যবদ্বীপের হিন্দু নই, হিমালয়ের হিন্দু নই, Arctic home in the Vedasএর—উত্তরমেরুর হিন্দু নই--আজ ভারতবর্ষীয় হিন্দু হইতে হইবে। আজ মোঙ্গলিয়ার নহে, তাতার-তুরস্কের নহে, পারশ্য-আফ্গানের নহে, আজ হইতে হইবে ভারতবর্ষীয় মুসলমান! এমন একান্ত ভারতবাসী হওয়ার উপরেই আজ আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করিতেছে! ভারতবাসী হইতে পারিলেই হিন্দু-সম্প্রদায় বা মুসলমান-সম্প্রদায় বা sectএর কথা আগে হইবে না। তখন বলিব, আমি আগে ভারতবাসী, পরে হিন্দু-সম্প্রদায় বা মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু বা মুসলমান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের এই বিশাল বিপুল গোটা ভারত-ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই! শুধু সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র বুদ্ধির হিসাবেই ভারত-ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার বিরোধ-কল্পনাটুকু পর্য্যন্ত সম্ভব হইয়াছে। এই কথাটা আবার লক্ষ্য করিতে বলি—Patriotism is a correction of superstition and the more we feel for our country the less we feel for our sect. আজ সমগ্র দেশবাসীকে—

সাম্প্রদায়িকতা

হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শী প্রভৃতি সকলকেই এই কথাটার উপর মনোনিবেশ করিতে হইবে। এক অখণ্ড ভারত, যাহাকে দুই করা যায় না—এক বিরাট্ সংহতি-শক্তিসম্পন্ন জাতি এই ভারতবাসী—চাই সেই জ্ঞান, চাই সেই সাধনা। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান সকলেই নিজ নিজ বিশিষ্ট সাধনার সম্ভার হস্তে ভারতের জাতীয়তার পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইবে। ভারতকে বাদ দিয়া যে বিশিষ্টতা তাহা নিশ্চয় সম্প্রদায়দোষে দুষ্ট—সুতরাং বর্জ্জনীয়, ইহা আজি আমাদের বুঝিতে হইবে। সেই ভারতের বিরাট্ জ্ঞানে যদি আমার অন্তরাত্মা পূর্ণ না হয়, তবে জাতীয় সাধনা মিথ্যা হইবে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন শুধু বাহিরের বস্তু হইয়াই থাকিবে। মনেও করিও না, 'পঞ্জাব' বা 'খিলাফতে'র খাতিরে হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন সম্ভব হইবে। কাহারো উপরে বিদ্বেষে সাময়িক ভাবে এই মিলন পুষ্টিলাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা যতক্ষণ সাম্প্রদায়িকতাকে বিদায় দিতে না পারিবে, ততক্ষণ হিন্দু-মুসলমানের স্থায়ী মিলন সম্ভব হইবে না। খিলাফত-সমস্যা, পঞ্জাবের বেদনা স্বল্পকালস্থায়ী মিলন ঘটাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা শুধুই প্রাণের টানে, প্রাণের দায়ে, বাহিরের বস্তু নিরপেক্ষ হইয়া গড়িয়া না উঠিবে তাহা স্থায়ী হইবে না। ভারতের সহিত যখন একাত্মতাবোধ করিব সাম্প্রদায়িকতা তখনই দূর হইবে। নতুবা, যতদিন কারাগার ততদিন বাহিরের চাপে

এক—কারাগারের প্রাচীরের চাপ উঠিয়া গেলেই আবাব নিজেরাই সম্প্রদায়ের গণ্ডী আঁকিতে বসিব। মুসলমান বা হিন্দুর সর্ব্বপ্রথম হইতে হইবে, এই অখণ্ড ভারতসম্প্রদায়ভুক্ত দেশমাতৃকার সেবক। সেইখানেই সাম্প্রদায়িক সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ হইবে, স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইবে না; আর যদি হয়ই, ভারতের দিক হইতেই তাহার সুমীমাংসা হইবে।

এই ভুলের জের টানিয়াই Communal Representation বাহির করিয়াছি। যে জাতি ম্যাগনাকার্টা (Magnacharta) গড়ে সে জাতি Communal Representationএর সেবা করে না, যে জাতি Magnacharta 'পায়' সে জাতি Communal Representationএর বাঁদরামীর বাটখারার দাঁড়িপাল্লায় পাওয়া রতন ভাগ-বাটরা করিতে বসে। আমরাও তাহাই বসিয়াছি। ব্রিটিশ সরকার ভারতের আর সব প্রার্থনা পূরণ না করিলেও লক্ষ্ণৌ প্যাকট বনাম ১৯ জনের সিদ্ধান্তানুযায়ী Communal Representation—ভাগবাটরার ফর্দ্দ মঞ্জুর করিয়াছে। মুসলমানগণ খুব পাইয়াছি ভাবিয়া কংগ্রেসে নাম লেখাইলেন; হিন্দুরা ভাবিল মুসলমানদের এবার দলে পাইয়াছি, আর কি, এবার ইংরেজকে দেখিব—দেখিব স্বরাজ কেমন করিয়া না দিয়া পারে, অন্ততঃ দ্বিতীয় একটা Magnacharta ইংরেজকে দিতে হইবেই। ইংরেজ আমাদের বেশ বুঝিল, একটু হাসিলও বুঝি। Divide and rule policyর যাঁহারা নিন্দুক তাঁহারাই হইলেন এবার ধারক!

সাম্প্রদায়িকতা

ভারতের প্রবুদ্ধ বুদ্ধি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন Communal Representationএর পক্ষপাতী হইতে পারে নাই। আপাততঃ ইহা একপ্রকার চলিলেও পরিণামে যেখানে এক অখণ্ড ভারত-জ্ঞানে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিতেই হইবে, সেইখানে ইহা কখনই সুফল প্রদান করে না, করিতে পারে না। আশ্চর্য্য এই, যখন ঘরে ফিরিবার সময়, তখন Congressও সেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন—সেই Communal Representationএর সমর্থন করিলেন। অথবা আশ্চর্য্যই বা কি, আত্মবঞ্চনা ও ভুলের বোঝার দুঃখ আমাদের বহাই চাই যে! মুসলমান মুসলমানের গণ্ডী বজায় বাখিবেন, হিন্দু হিন্দুর গণ্ডী বজায় রাখিবেন; পার্শী, জৈন, খৃষ্টান, তাঁহাদের নিজ নিজ গণ্ডী বজায় রাখিবেন, তার পর Non-Brahmins, নমঃশূদ্র, পরিশেষে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, যদি তাহার গণ্ডী বজায় রাখিতে বসে তাহা হইলে ভারতের মিলনভূমির ভিত্তি ধ্বসিয়া যাইবে, তাহাতে আর দুঃখ কি?

অবশ্য সময়বিশেষে কোন কোন সম্প্রদায়কে কতকটা সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন হয়। যদি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে অনুন্নত হয়, তবে সেই সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করিয়া তুলিতে নানাবিধ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হইবে ভারতের দিক্ হইতে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির দিক্ হইতে নহে। ভারতবাসী সকলেই আমরা এক, —এই ভাবটী যেমন মনে রাখা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে এই

ভাবটীর পরিপন্থী সত্যকার বৈষম্যও দূর করিতে হয়। যদি উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে সমকক্ষ মনে না করে, তবে মিলন সম্ভব হয় না। পরস্পর সমকক্ষ, এই ভাবে আমাদের যেমন অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, তেমনি অনুন্নত কোন সম্প্রদায়কে সত্যসত্যই শিক্ষায়-দীক্ষায়, অর্থে-সামর্থ্যে, রাজনীতিচর্চ্চায় সমকক্ষ করিয়া তুলিতে সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা করিতে হইবে ও অবসর দিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কতকটা প্রয়োজন সে কারণে থাকিতে পারে; কিন্তু সেই সুবিধা দেওয়াব পদ্ধতিতে যদি সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিই করে, সম্প্রদায়জ্ঞানই যদি এক ভারত-জ্ঞান হইতেও বড় হইয়া উঠে,—ভারতে তাহা হইয়াছে ও হইবে, তবে সেই বিধান কখনই শুভ হইবে না। বর্ত্তমান Communal Representation সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি করিবে বৈ কমাইবে না। সুতরাং ইহা, তেমন সামান্য প্রয়োজন থাকিলেও বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ত্যজ্য। আমরা বুঝি না, শ্রেষ্ঠ মুসলমান দেশভক্তকে নির্ব্বাচন করিতে কেন হিন্দুব আপত্তি হইবে; কোন হিন্দু তাহার স্বার্থ কেন তেমন মুসলমান নেতার হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবেন না—বুঝি না। বুঝি না, মহাত্মা গান্ধী বা চিত্তরঞ্জনের মত ব্যক্তির হাতেই বা কেন মুসলমানের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স বা কাউন্সিলের সর্ব্বত্রই ভারতের যোগ্য ব্যক্তিই যাইবেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে নন, কিন্তু ভারতবাসী হিসাবে

সকলে নির্ব্বাচিত হইবেন। সম্প্রদায়ের অতীত ভারতবাসীকে কি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবাসী 'ভারতবাসী' বলিয়া নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না? ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমানের একটু অসুবিধা হইলেও সেই পথই আমাদের শ্রেয়ঃ—সেই পথেই আমাদের অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহাই মিলনের পথ, স্বরাজের পথ, তাহাতেই অখণ্ড ভাবতবর্ষ গড়িয়া উঠিবে।

. সেই মিলন, সেই মন, সেই উদারচিত্ত আসিবে কখন? না, যখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতবাসী-জ্ঞানে অন্তর-বাহির পূর্ণ করিব—আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম কোন ব্যাপারই যখন ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া কল্পিত হইতে পারিবে না। যেদিন আমাদের বাঁচা-মরা, সভ্যতা-সম্পদ, ধর্ম্মসম্প্রদায় নিঃশেষে এই পবিত্র তীর্থে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই দিন স্বভাবতঃই (বাহিরের প্রয়োজন ছাড়াও) দেশাত্মবোধের বেদীমূলে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিব। ভারত বহু ভুল করিয়াছে—তাঁহার বহু ভুল ভাঙ্গিয়াছে। বিধাতা সকল দ্বার হইতে বঞ্চিত করিয়া ভুল ভাঙ্গিবার কাজ করিয়াছেন। স্বীকার না করিলেও ইহা ঠিক, খিলাফতের ভুল কামালপাশা ভাঙ্গিয়াছেন। কামাল ত বলিতে পারিলেন না, তিনি আগে মুসলমান, তারপর তুর্কী। সে আজ সৃষ্টির যজ্ঞশালায় বসিয়াছে—ভুল তাহার হইবে কেন, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভুল বুঝিবে কেন? তিনি তুর্কীর মুসলমানকে ও খৃষ্টানকে আগে জানিতেছেন তুর্কী বলিয়া, পরে খৃষ্টান বা

মুসলমান বলিয়া। এই জাতীয়তাই জাতিকে বাঁচায়, সেই সঙ্গে সম্প্রদায় ও ব্যষ্টিকেও বাঁচায়। তেমনি আজ ভারতের হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে প্রথম জানিবে ভারতবাসী, তৎপরে জানিবে হিন্দু বা মুসলমান। সেই ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মিলনক্ষেত্রে বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবান আমাদের জাতীয় ললাটে শুভ্র বিজয়টীকা পরাইয়া দিবেন। বিরুদ্ধ-শক্তি সেইখানে বিফল হইয়া পড়িয়া থাকিবে। হে ভারতভাগ্য-বিধাতা, আমাদের একান্তভাবে ভারতবাসী করিবে কি ?

শক্তির সন্ধান

আচারের নিয়মের বজ্র বাঁধনে মানুষকে বাঁধিয়া রাখিলেই মানুষের অন্তর সংযমের সত্যকে লাভ করিতে পারে না, আবার ভিতরের বন্ধনকে অবহেলা করিয়া বাহিরের স্বাধীনতার অভিনয়েও মুক্তির সত্যকে মানুষ লাভ করিতে পারে না। অই আচারকে আমরা যখন একান্ত বড় করিয়া তুলিলাম তখন সত্যের উপর অত্যাচার অনাচার চলিল। তখন কতখানি টিকি ফোঁটার চর্চ্চা করিয়াছি ইহাই হইল বড় কথা, কতখানি ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে—সেই প্রশ্ন উঠিল না। একথা বুঝিলাম না যে, আচার নিয়মের বাঁধনে বদ্ধ হইয়াও যদি শক্তি ও সত্যের নিয়মকানুন না মানি, বিশ্ববিধাতার সনাতন নিয়ম না মানি আচারের মিথ্যা হিসাব নিকাশ আমাদের মুক্তির পাথেয় জোগাইতে পারিবে না। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তাই।

অসহযোগ আরম্ভ করিয়া ঐ নিয়মের বাঁধনেই জাতিকে বাঁধিতে চাহিয়াছি—কোথায় কতটুকু অসহযোগ গেল বা থাকিল, তাহা লইয়াই হিসাব নিকাশ কষিতে বসিয়াছি, শেষে দেখা গেল শক্তির ঘরে হিসাবের ভুল থাকিয়া গিয়া গোটা হিসাবেই গোল রহিয়া গিয়াছে। যে দুর্জ্জয় দুর্ব্বার জাতীয় শক্তি লাভের ব্যাকুলতায় অসহযোগ,—সেই শক্তির দিকে আর তত নজর থাকিল না, অসহযোগের নিয়ম মানিয়া চলাই

তখন বড় হইয়া উঠিল,—যেমন টিকি ফোঁটাই ধর্ম্মের চাইতে বড় হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ব্বল জাতের সহযোগিতার কথা বেয়াদবী বেকুবী। আত্মসম্বিত যোল আনা না খোয়াইলে কোন দুর্ব্বল জাতি কোনও সবল জাতির সঙ্গে সহযোগিতার কল্পনাও করিতে পারে না। যেখানে সহযোগিতা আদৌ অসিদ্ধ সেখানে শুধু শক্তির মাপকাঠিতেই অসহযোগিতা বা সহযোগিতা বিচার্য্য। দুর্ব্বলতার জন্য যে জাতির সহযোগিতা আত্মবঞ্চনা বা বেকুবীতে পরিণত হইয়াছে, সে জাতির অসহযোগিতা সেই জাতির জাতীয় দুর্ব্বলতা থাকিতে কোন্ মতে সিদ্ধ হইবে? বাহিরের শত আয়োজনকে যেমন অন্তরের দৈন্য ব্যর্থ করিয়া দেয়, তেমনি জাতির অন্তরের দৈন্য জাতির বাহিরের সহযোগিতা ও অসহযোগিতার কোথাও সম্ভ্রমকে বজায় রাখিতে পাবে না।

যোগাযোগ শক্তির সন্ধানেরই জন্য। তাই একান্ত ভাবে এই জাতীয় শক্তি অর্জ্জনের মাপকাঠিতেই সকল বিচার্য্য—অন্য মাপকাঠি আর নাই।

অহিংসার আইন কানুন কতখানি আজ বজায় রাখা গিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতেই আমরা ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু, শক্তিহীন ভীরু বলিয়া কতটা মার খাইয়া মার চুরি করিলাম সেই হিসাব খতাইতে হয় নাই। প্রবুদ্ধ ভারত শক্তির উপাসক; সহযোগ বা অসহযোগ কিছুতেই সে আত্মবঞ্চনা করিতে পারিবে না। যে অসহযোগ তাহার শক্তির সন্ধান

দেয় তাহা শুধু শক্তির হিসাবেই বিচার্য্য অন্য কোন যোগাযোগের নীতি-কথা সেখানে নাই। দুর্ব্বলতার জন্য যাহারা মৃত্যুর দ্বারে আগাইয়া চলিয়াছে কোনও যোগাযোগের নীতির বিলাস লইয়া সময় নষ্ট করিবার মত অপর্য্যাপ্ত সময় তাহাদের কৈ? নাই বলিয়াই কোন্ কাউন্সিলে কোন্ কমিটিতে গিয়া না গিয়া কোন্ যোগ-নীতি নষ্ট হইল বা থাকিল, ইহা আর জাতির কাছে বড় কথা নহে। জাতির কাছে বড় কথা কোথায় গিয়া সে শক্তির অমৃত লাভ করিতে পারিয়াছে, কোথায় গিয়া কোথায় না গিয়া সে জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রনের, আত্মরক্ষার চেতনায় প্রবুদ্ধ করিতে পারিয়াছে।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বলহীন কোন শ্রেয়ঃকেই লাভ করিতে পারে না—না কোন যোগ, না কোন মুক্তি, না কোন জাতীয় সম্মান। ইংরেজ শক্তিশালী স্বদেশবৎসল জাতি, দুর্ব্বল আমরা ও-জাতির সমকক্ষ নহি; সেবার অধিকার কোথাও পাইলেও সহযোগিতার অধিকার কোথায়?—অসহ-যোগিতার কথা নাই তুলিলাম। কোন বলবান্ জাতি, যে শক্তিকেই মাত্র সম্বল করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তেমন বলবান্ কোন জাতি কি কখনো আমাদের দুর্ব্বল জাতিকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে? ইংরেজ যদি না দেখে দোষ কাহার? যদি বল, কেন, যদি সত্যই সমকক্ষ না ভাবিতে পারে, ন্যায্য সম্মান দেখাইতে না পারে, ঘোষণাবাণী প্রচার করিল কেন, সাম্য ন্যায়ের কথা শুনাইল কেন, অত প্রতিশ্রুতি

দিল কেন? প্রশ্ন করা চলে বটে, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর কোন সবল জাতির দুর্ব্বল জাতিকে দিতে হয় নাই। হিন্দু ব্রাহ্মণ আমরা শাস্ত্রের বক্ষ খোদিয়া 'যত্র জীব তত্র শিব' কি লিখি নাই? কিন্তু সে লেখার বলে ব্রাহ্মণ জাতি 'পারিয়া' জাতিকে কখনো সমকক্ষ ভাবিবে বা সম্মান করিবে কি? জেতা আর্য্য আমরা বিজেতা অনার্য্যদের উপর কম 'দয়া' দেখাই নাই। ব্রাহ্মণ, পারিয়া পঞ্চম শূদ্রকে সমকক্ষ ভাবে না; শাস্ত্রবচন waste paper basketএ ফেলিয়াই জাতিভেদের আচারে অনাচারে তাহাদের বাঁধিয়া পঙ্গু করিয়াছে। শাস্ত্রে উদার বাণী যেমন আমাদের আছে ইংরেজও তাহার আইন আদালত কমিশন ঘোষণাবাণীতে উদারতা দেখাইতে কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু দুর্ব্বল পারিয়াকে যে নজিরে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ পথ মাড়াইতে দেয় না, ইংরেজের আত্মাভিমান ও স্বার্থের শাস্ত্রে তেমন বাধা নিষেধের অভাব কি? সুতরাং দেখা গেল দেশ কাল পাত্রে ভেদ নাই,—দুর্ব্বলতাই ব্যক্তিকে ও জাতিকে বঞ্চিত করে, আবার তাহার অভাবেই জাতি ও ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য সম্মান লাভ করে। সুতরাং দুর্ব্বলতাকে কোথাও জিয়াইয়া রাখিয়া কাহারো উপরে অভিমানে বা রোষে বা কোন যোগাযোগে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রনের আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্ম-সম্মান লাভের উপায় নাই।

বেশী দিনের কথা নহে, কোন এক চা-বাগানের এক মিস্ত্রী ও তাহার সহকারী দশ জনকে সাহেব-ম্যানেজার বিনা দোষে

প্রহার করে, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করে। মার খাওয়ার পরে মিস্ত্রী মহাশয়ের খেয়াল হইয়াছে যে, সাহেব তাহাদের অন্যায়-রূপে মারিয়াছে, অপমান করিয়াছে। আর সেই হেতুই তাহার প্রতিকারের জন্য সংবাদপত্রওয়ালাদের অনুরোধ করা হইয়াছে, যেন একটু বিশেষভাবে আন্দোলন করা হয়।

এই ত অবস্থা! যে জাতির অধিকাংশ এই রকম, তাহাদের কি হিংসা, অহিংসা, সহযোগ, অসহযোগ নীতির সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার অবসর দিতে আছে? তমাভিভূত মানুষদের সত্বের অভিনয় করিবার সুযোগ দিবে? মনেও করিও না, যাহারা মার খাইয়াছে তাহারা সবাই নিরীহ গো-বেচারী। খুঁজিলে হয়ত দেখিবে, ইহারাই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল স্বজাতি পীড়ক, ভাইয়ের মাথা ফাটাইতে তত ইতস্ততঃ করে না, যত ইতস্ততঃ করে অত্যাচারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে একটু দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে। সাহেব-ম্যানেজার বন্দুক ছুঁড়ে নাই, বেত্রাঘাত করিয়াছে, তবুও দশজন ভারতীয় মিস্ত্রী দাঁড়াইয়াই মার খাইল, একটু সার্থক প্রতিবাদ করিতে ভরসা পাইল না। কিন্তু সেই নীরবে অহিংস মার-খাওয়ার বিবরণ কাগজে প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছে।

কিন্তু দুঃখ কি শুধু ঐ মার খাওয়ায়? তাহা ত নহে,—মর্ম্মান্তিক দুঃখ ইহাই যে বেত্রাঘাত খাইয়াও প্রতিকারের জন্য বেত্রাঘাত করিতে জাতির আর প্রবৃত্তি নাই। অথচ সকল জাতিই এই সহজ স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত (দেবোচিত

না হইতে পারে) প্রতিকার-প্রবৃত্তি লইয়াই বাঁচিয়া থাকে এবং যতকাল পৃথিবী আছে ততকাল থাকিবে। অন্যথায় কেবল আত্মপ্রবঞ্চনাই আমাদের জাতির লভ্য হইবে। আমরা গীতা উপনিষদ নিত্য আওড়াইয়াও ভয়ে ভীত; আর বলদর্পিত ইংরেজ একাই দশজন ভারতীয়কে মারিবার ভরসা করে। বলিবে ইংরেজের রাষ্ট্র-শক্তিই তাহার বুকের ভরসা বাড়াইয়াছে, কব্জির বল বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু আমরা যে কেবল ইংরেজের কাছেই এই ক্লীবত্ব দেখাই আর অহিংসার বড়াই করি তাহা নহে; আমাদের কাছে ফরাসী জাপানী চীনে কাবুলী কাফ্রি সকল সাহেবই বিভীষিকা। আঘাত প্রতিরোধ করিতে আমরা জাতি হিসাবে অনভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছি। যে আমরা অনায়াসে ভায়ের মাথায় লাঠি বসাই সেই আমরাই উপরোক্ত যে কোন বিদেশী সাহেবের—সে কাবুলী সাহেবই হউক বা কাফ্রি সাহেবই হউক—কাছেই জড়ভরত হইয়া পড়ি।

এমন আমাদের কাছে হিংসা অহিংসার মূল্য কোথায়? অহিংসার নিয়ম মানিয়া ইহারা সঙ্গে সঙ্গে যখন মনুষ্যত্বের, সত্যের নিয়ম নিত্য ভাঙ্গিতে থাকিবে, অহিংসা তখনই কি পরিহাসের ব্যাপার হইবে না। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও তেমনি অসহ-যোগের বা সহযোগের নিয়ম মানা না মানায় কি আসিয়া যাইবে, যদি জাতির অন্তর ক্ষেত্রে শক্তির দেবতাকেই বসাইতে না পারিল। শক্তি যেখানে আমার জাতীয় জীবনে সত্য হইল না, তখন কোন্ যোগাযোগ, কোন্ নীতি দুর্নীতি

আমার জাতীয় সিদ্ধিকে সম্ভব করিবে ? জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবী, আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী, আত্মসম্মানের দাবী কোনও পন্থার শুদ্ধাশুদ্ধিতে, পন্থার সঙ্কীর্ণতায় বা প্রশস্ততায়, মিটিবে না। কোন যোগাযোগের কথা নহে, এ শক্তির কথা। শক্তি অর্জ্জনের মাপকাঠিতেই হিংসা অহিংসা যোগাযোগ, গ্রাহ্য বা বর্জ্জনীয়। প্রবুদ্ধ ভারতকে কেবল মাত্র এই শক্তির কথা ভাবিয়াই—সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মক্ষেত্রে ভালমন্দের বিচার করিতে হইবে। বিচারের আর কোন পথ নাই।

চাওয়া ও পাওয়া

মানুষ যাহা চায় তাহা পায়। বিশ্বের সকলেই যাহা চাহিয়াছে, যাহার জন্য সাধনা করিয়াছে, তাহা পাইয়াছে। আমরা যাহা চাহি নাই, তাহা যে পাই নাই—এতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

ভারত কায়মনোবাক্যে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা যে পায় নাই, তাহা নহে। কিন্তু সেই চাওয়ার মত চাওয়া অনেক দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। ভারতের সেই গৌরব-যুগ—যে যুগে ভারত বড় কথা কহিয়া ছোট কিছু চাহিতে পারিত না সে যুগ কবে শেষ হইয়া গিয়াছে! তার পরই ফাঁকির যুগ চলিয়াছে। এই ফাঁকিই নাকি আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। যেখানে যা কিছু জাতীয় দৈন্যের, তাহাও আজ এই ভারতীয় বিশেষত্বের নামেই ছাড়পত্র পাইতেছে। তাই ত আজ বুঝাও শক্ত, সত্যই আমরা কি চাই—আর সত্যই, কি চাহিয়া জাতি হিসাবে কি-ই বা পাই নাই।

'পাশ্চাত্য জাতি জড়বাদী'—এ একটা দুর্নাম আমরা প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীরা দিয়া থাকি। পাশ্চাত্য জাতিগুলি জাতি হিসাবে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা কিন্তু পাইয়াছে; দেহ-বলে, অর্থ-বলে বিজ্ঞান-বলে, তাহারা বল বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহাদের ঐ, বৃদ্ধির লক্ষণ তাহাদের চলায়-বলায়, সুখ-সম্ভোগে সুস্পষ্ট,

তাহাদের জীবন-যাত্রার ভঙ্গীতে সে শক্তিসামর্থ্য পরিস্ফুট। তাহারা জগতে, অর্থে, সামর্থ্যে, শারীরিক বলে, নিয়মানুবর্ত্তিতায়, সঙ্ঘ-শক্তিপ্রভাবে, ব্যবসায়ের কার্য্যকুশলতায়, সামরিক শক্তিতে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছে, তাহা তাহারা করিয়াছে। দেশ বিদেশে যেখানেই তাহারা যায়, তাহারা যে শ্রেষ্ঠ এ কথাটা তাহারা প্রতিযোগিতায় অপরকে পরাস্ত করিয়াই প্রমাণ করে। 'এ শ্রেষ্ঠত্ব একেবারেই অনিত্য', 'এ মিথ্যা সভ্যতা', 'জড়শক্তির খেলা'—ইত্যাদি উক্তি করিয়া দেহ-বুদ্ধির অতীত আত্মিক বলে বলশালী, একান্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি বা জাতি যদি তাহা উপেক্ষা করে, তাহা করুক, বলার কিছু নাই। কিন্তু আজ ভারতবাসী আমরা, ওদের ঐ ঐশ্বর্য্য-দ্বারে লাঞ্ছিত হইয়া, ঐ ঐশ্বর্য্যের দুরারোহ প্রাচীরে আরোহণের চেষ্টা করিয়াও যখন প্রাণধারণের মত অর্থও সংগ্রহ করিতে পারি না, তখন আমাদের মুখে ঐ উক্তিগুলি আর যাহাই হউক তাহা যে আধ্যাত্মিক নহে, এ একেবারেই ধ্রুব।

শক্তির কতখানি জড় আর কতখানি চিন্ময় বুঝা শক্ত। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে যে শক্তির খেলা আজ দেখিতেছি, তাহা আজিকার আধ্যাত্মিক জাতি আমাদের নাই বলিয়াই কি তাহা অকিঞ্চিৎকর? যে শক্তির তাহারা উপাসক, বিশ্বশক্তিরই কি তাহা শক্তি নহে? 'জড়বুদ্ধি', 'দেহবুদ্ধি' বলিলেই ত হইবে না। যে আমরা গীতার শ্লোক মুখস্থ করিয়াও জাতি হিসাবে মৃত্যুভয়ে ভীত, আর যে ওরা গীতা না পড়িয়াও

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াই মৃত্যুঞ্জয়; সেই আমাদের দেহবুদ্ধি অধিক, না ওদের দেহবুদ্ধি অধিক? ব্যক্তির কথা ব্যতিক্রমের কথা; সমষ্টির কথা, জাতির কথাই নিয়মের কথা। আমাদের দেশের ব্যক্তিবিশেষের ব্যতিক্রমকে নিয়মের ভুল করিলে ত আজ চলিবে না।

ভারতবর্ষেরও এমন দিন ছিল, যখন সে সহজ সোজা হইয়াই চলিত; ক্ষাত্র-শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইত, সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিত; বাণিজ্যদ্বারা লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিত, আত্মরক্ষার্থে দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার্থে আততায়ীকে বিনাশ করিয়া 'স্বধর্ম্ম' রক্ষা করিত, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সমস্তই তাহাকে জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিত; জগৎকে সুন্দর করিয়াই ত্যাগকে সম্ভব করিয়া তুলিত,—'জগৎ মিথ্যা' বলিয়া মুখ ফিরায় নাই। তার পর আসিল ভারতের তামস যুগ, যখন দেশের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লোক, তাঁহারাই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; ভোগের পুতিগন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া 'বৈরাগ্য-শতক' প্রভৃতি প্রচার করিতে লাগিলেন; ক্রমে আমরাও সাত্ত্বিক হইলাম,—রজঃশক্তি স্বেচ্ছায়, সযত্নে এড়াইয়া চলিতে লাগিলাম; শান্ত, সুশীল, বিনয়ী, ক্ষমাধর্ম্মী, হইলাম; অল্পে তুষ্টি, ও দারিদ্র্য গৌরবের বস্তু হইল; ভিক্ষায় জীবন-ধারণ বৈরাগ্যের আদর্শ হইল; স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকে দগ্ধ উদর পূরণ করিবার তাগিদ আসিল; কে আর দগ্ধ উদরের জন্য উদ্যমের বালাই রাখে! যাহাই হউক, জগতের লোক,

তেমন করিয়া শাকান্নে উদর পূর্ণ করিবার আগ্রহ দেখাইল না, অল্পে তুষ্ট থাকিতে একেবারেই নারাজ হইল; ভিক্ষাপেক্ষা জোর-জবরদস্তিকে গৌরবের বস্তু ভাবিল—ভারতের দিকে চোখ পড়িল! তাহাদের ভোগের আর আমাদের বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সহযোগিতায় জাতীয় নির্ব্বাণের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল! আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ-স্পৃহা, বড়'র নামে আত্ম-প্রবঞ্চনা, এদিকে সাধারণ মানুষের 'কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, আলস্য, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি, জাতিকে প্রতিযোগিতায় অক্ষম করিল। আমরা আধ্যাত্মিক আদর্শে জাতিটাকে গড়িতে গিয়াছিলাম, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সে দিকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন; কিন্তু একটা জাতি একচোটে অমনি আধ্যাত্মিক, ধার্ম্মিক হইয়া উঠে না—ফলে ধার্ম্মিক ত হইলই না—সাধারণ মানুষের মত জীবন-যাত্রায় জয়ী হইবার সামর্থ্যটুকুও সে হারাইল! না হইল বৈরাগী, না হইল ভোগী। ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করিয়া—আধ্যাত্মিকতা জাতি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্যের দ্বারেই লাঞ্ছিত হইয়াছে!

তাই ত আজ এ প্রশ্নটা আমাদের মনে জাগে—হইলাম কি! এত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা পড়িয়াও যদি ঐশ্বর্য্যের দ্বারে লাঞ্ছিতই হইতে হয়, তবে ভাল করিয়া অর্থ-নীতি চর্চ্চা করিলাম না কেন? 'অচ্ছেদ্য', 'অদাহ্য' আমি, এ জ্ঞান থাকিলেও যদি জীবন-ভয়ে আত্মরক্ষার্থে পলাইতেই হইল, তবে আত্মরক্ষার—জীবনরক্ষার শক্তি-সামর্থ্য অর্জ্জন করিলাম

না কেন? এত বড় বিরাট্ সভ্যতার মালিক নাকি আমরা? কিন্তু হইলাম কি—সে ধর্ম্ম-সভ্যতার কি এই পরিণতি? একজন শ্রেষ্ঠ ভারতবাসী বলিয়াছিলেন, 'কেন, আমরা একটা বিষয়ে ত অন্ততঃ জয়লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য জাতি সেখানে পরাস্ত! আমাদের সকল গিয়াও যে সেদিকে জয় লাভ করিয়াছি, ইহাতেই আমাদের সভ্যতা সফল হইয়াছে। সেটী হইতেছে আমাদের 'কাম-জয়'। জাতি হিসাবে আমরা রিপুজয়ী! পৃথিবীর অন্য কোন জাতি হিন্দুর মত এ বিষয়ে জয়ী হয় নাই।' সত্যই কি তাই! আজিকার কথা ছাড়িয়াই দিলাম—ভারতবর্ষ পরাধীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের যে অবস্থা দেখি, তাহাতে এ সান্ত্বনারও যে স্থান নাই! 'বচন মাত্র সাধ্যা'—প্রভৃতি কথা যখন পড়ি, শাস্ত্রী মহাশয়ের 'সাহিত্যসংহিতায়' মধ্যযুগের যে নৈতিক অধঃপতনের কথার উল্লেখ দেখি; রাজা, প্রজা, মন্ত্রী, পারিষদ প্রভৃতির যে নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় না, পাশ্চাত্য-দেশের ব্যভিচার এখান হইতে বেশী। বহু-পত্নীকতার কথা নাই তুলিলাম—সে যুগে রাজারা দ্বাদশ সহস্র রমণীকে ভোগার্থে গ্রহণ করিয়াছেন, 'ধর্ম্মার্থে-ক্রিয়তে ভার্য্যা' শাস্ত্র-নীতি চমৎকার রক্ষিত হইয়াছে!

তারপর ধর্ম্মমন্দিরে পঞ্চ সহস্র দেবদাসী, রিপুজয়ের গৌরব বাড়ায় নাই—হীন ব্যভিচারে, ভণ্ডামীর পাপে জাতিকে আরও অন্তঃসার শূন্য করিয়াছে।

কাজেই আমরা জাতি হিসাবে 'কামজয়ী' একথা বলিতে ভরসা হয় না! তবে হইলাম কি? ঐশ্বর্য্য চাহি নাই—চাওয়ার মত চাহি নাই; ধর্ম্ম চাহিয়াছি, তাহাও চাওয়ার মত চাহি নাই, চাহিতে পারি নাই; সুতরাং এই দুইটার কোনটাই পাই নাই—যাহা পাইয়াছি, তাহা অবসাদ—জাতীয় মৃত্যু! এই মিথ্যার জন্যই কি ভারতবর্ষ তপস্যা করিয়াছিল? আজ ভারতের সভ্যতা ধূলায় লুটায়—'তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে কেমন ক'রে সইব?' ভারতের সভ্যতার কঙ্কাল আমরা—আজ এ সওয়ার জন্যই কি বাঁচিয়া আছি? ধূলা ঝাড়িয়া এ সভ্যতা-মুকুটকে জাতির মাথায় তুলিয়া দিতে পারিবে কি? আজ জাতির অন্তস্তল খুঁজিয়া দৈন্য কোথায় বুঝ—আর ফাঁকিতে খাঁটি আসিবে না। সমস্ত দৈন্য ও মিথ্যাকে দূর করিয়া, দেহ-মন-আত্মায় স্বরাট্ হও! অন্তর-বাহিরে, ইহকাল-পরকালে দেশ ও বিশ্বে, রাষ্ট্রজীবন ও ধর্ম্মজীবনে—নিজের স্থান করিয়া লও। দেহ ছাড়িয়া মন পাইব না—আত্মা পাইব না; অন্তর ছাড়িয়া বাহিরও চাহি না, ইহকাল ছাড়িয়া পরকালকেও পাইব না; দেশ ছাড়িলে বিশ্বও পাইব না, রাষ্ট্র ছাড়িলে ধর্ম্মও ছাড়িবে—আজ সজাগ হইয়া এই কথাই কহিও, এই চাওয়াই চাহিও।

সমগ্র বিশ্ব যাহা চায়, তাহাই পায়; যাহা চাহিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে—ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম কি কেবল দুর্ভাগা আমাদের বেলায় ব্যর্থ হইবে—তা' হয় না। আজ চোখ মেলিয়া

ভারতের দাবী

বিশ্বের দিকে তাকাও। চাহিয়া দেখ, কি তাহারা চাহে—কেমন করিয়া চাহে। বিশ্বে সকলেই বাঁচিতে চাহে, তুমিও চাও। কিন্তু বিশ্বের সবাই যেমন করিয়া বাঁচে, তোমাকেও তেমন করিয়াই বাঁচিতে হইবে; মিথ্যা একটা বিশেষত্বের নামে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিও না। তুমি বলিবে, বিশ্বের সঙ্গে আমার কি-ই বা সম্পর্ক, আমার একটা বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলেই আমরা মুক্ত হইব। তবে ইহাও জানিয়া রাখ, বিশ্বছাড়া—সৃষ্টিছাড়া কোনও বিশেষত্ব যদি তোমার থাকে তবে, তোমার মৃত্যুর জন্যই বিশেষভাবে বিধাতা তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি ভুল না বুঝিয়া থাকি, তবে বৈচিত্র্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই ভারতের বিশেষত্ব। একান্তভাবে যাহাকে হিন্দুর বিশেষত্ব বলি, বা মুসলমানের বিশেষত্ব বলি, তাহা ভারতের বিশেষত্বের মধ্যে নাই। যুগে যুগে নানা বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করিয়া এই শিক্ষাই ভারত পাইয়াছে যে, কোন কিছু বাদ দিয়া নহে, সকলকে গ্রহণ করিয়াই সে বিশেষত্ব, যদি কিছু থাকে, লাভ করিয়াছে। তাহার সেই বিশিষ্ট সাধনার সঙ্গে জগতের সাধনার কোনই বিরোধ নাই। জগৎ ভোগের পথে চলিয়াছে, আর আমরাই ত্যাগের বাদসা, এই কথা বলিয়া ত্যাগ-ভোগ দুইটাকে হারানোই ভারতের বিশেষত্ব নহে। ঘোর তামস-জীবনে শুধুই পবিত্র তত্ত্বকথা শুনাইয়া লাভ নাই। অবসাদ ও পরবশতাকে যেমন শান্তি আখ্যা দানে সুখী হইয়াছে,

ভা৲স-জীবন ধন্য করিয়াছে, তেমনি গুপ্তভোগ হীন ছোট 'র্থকে বৈরাগ্যের নামে চালাইয়া নিজের সঙ্গে জাতিকে বঞ্চি করিবে—এক পুরুষে না হউক, পরবর্ত্তী পুরুষে নিশ্চয় করিবে। ভারতের কোন সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বকে বজায় রাখিতে ভারতের চোখ একটা কাণা করিয়া রাখিতেই হইবে, এ কেমন দুর্ব্বুদ্ধি? যাহারা বুকে হাটাইলেই বুকে হাটে, তাহাদের ক্ষমার বিশেষত্বের কথা বলিতে নাই, যাহারা কর্ম্মবিমুখ, কর্ম্মত্যাগ-রূপ পরম বিশেষত্বের বড়াই তাহাদের করিতে নাই। করিলে ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দুঃখের কথা আর বলিব কি? বিশ্বপ্রেম আমাদের মধ্যে নাকি জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু মুহ্যমান হইয়াছিল ভ্রাতৃপ্রেম,—ফলে ছারপোকা-হত্যা হইতে হস্তকে পবিত্র রাখিলাম, ভাইয়ের রক্ত 'খটমল'কে খাওয়াইবার গর্ব্ব করিতে! মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে .দেশ দান করিয়াও জাতির সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বন্ধনেরই অলঙ্কার প৷ লাম। পাশ্চাত্য জাতি ভোগী, ঐশ্বর্য্যশালী বীর মহাকর্ম্মী, উগ্র, নির্ভীক, দুর্জ্জয়, উৎসাহী, স্বজাতিপ্রিয়, সঙ্ঘবদ্ধ; আর আমরা ভোগবিমুখ নহি, অভুক্ত, দীনহীন, ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল, দুর্ব্বল, ভাবপ্রবণ, নিরীহ, ভীরু, উদ্যমহীন, স্বজাতি-বিদ্বেষী, শত-বিচ্ছিন্ন —ইহাই কি ভারতের বিশেষত্বের দান!

যাহারা জাতি হিসাবে নিজেদের সত্ত্বগুণী বলিয়া মনে করে, তাহারা যখন পরবশতার বন্ধনে বাঁধা পড়ে, তখন সত্ত্বগুণীর ৲েশটুকু টানিয়া নিয়া তৃপ্তিকে অবসাদে, ক্ষমাকে অক্ষমতায়,

নিবৃত্তিকে আলস্যের মধ্যে পাইয়া সেই তমোভাবকেই 'সত্ত্ব' বলিয়া কখনো জ্ঞাতসারে কখনো বা অজ্ঞাতসারে—মনকে ভুলায় পরাধীন জাতির পক্ষে সেই অতীত সত্ত্বগুণীদের স্মৃতি হয় .যম কাল ; কারণ, ঘোর তামসিক অবস্থায়ও ঐ সত্ত্বভাবের 'বাক্য' উচ্চারণে তাহার কোন বাধা থাকে না। আর থাকে .না বলিয়াই তামসিক অবস্থায়ও অতীত সত্ত্বের নেশায় বন্ধনকে ছাড়িয়া মুক্তিকে পাইতে ব্যাকুল হয় না। কিন্তু জাতি হিসাবে যাহারা রজোগুণী, তাহাদের এই একটা দিকে সুবিধা থাকে তাহারা যদি কখনো পরবশ হয়—তবে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় তাহারা হয় সেই বন্ধন ছিন্ন করে, নয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণীরা যতক্ষণ স্বাধীন ততক্ষণ থাকেন ভাল, কিন্তু পরবশতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সহজেই তামসিক অবস্থায় পৌঁছান ; তখনকার সম্বল বড় কথা —ছোট কাজ ! অতীত মহিমার স্মৃতি লইয়া, সেই শাস্ত্র লইয়া, বিশ্বে দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টাই হয় তখন প্রধান ক... নিজের পায়ে দাঁড়াইবার নহে ! শক্তিকে আর তখন মানেন না, মানেন স্মৃতিকে !

তাইত দুঃখ হয়, অত সব উচ্চ আদর্শের মালিক হইয়াও আমরা সকল হারাইলাম কেমন করিয়া ? 'সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং' যাঁহাদের কথা, তাঁহাদের দেশে সর্ব্ববন্ধনের প্রভাব কেন ? 'যত্র জীব তত্র শিব'এর দেশে নারায়ণ অস্পৃশ্য—লাঞ্ছিত কেন ? 'যত্রতু পূজ্যতে নারী রমন্তে

তত্র দেবতা' যাঁহাদের কথা, সে দেশের নারীর স্থান আজ কোথায়? ভারতের বিশেষত্ব কি ইহাই আনিয়াছে?

ভারতের বিশিষ্ট সাধনা একদিন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া জাতিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষের সন্ধান দিয়াছিল। সেই আদর্শ ভারতে প্রথম গ্রাহ্য হইলেও তাহা ভারতেই কেবল নিবদ্ধ থাকিবে না, আজ অথবা কাল সমগ্র জগতেরও ইহাই হইবে সাধ্য-আদর্শ। তখন এই পরম সত্য আর ভারতের বিশেষত্ব নহে, সকল সভ্য জগতেরই বিশেষত্ব হইবে। কিন্তু আজিকার ভারত সেই আদর্শ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন-পথ হইতে কত দূরে? মিথ্যাই বিশেষত্বের নামে পাশ্চাত্য জাতির শক্তি-সাধনাকে ব্যঙ্গ করিও না। আজ জাতির অভাব, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষার দিকে চাহিয়া চাওয়াকে সরল, সহজ, স্বাভাবিক আন্তরিক করিয়া তোল, পাওয়া তবেই সত্য হইবে। ভারতের দাবীকে অপ্রতিহত করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরি চালাইলে চলিবে না। অতীতের শিক্ষা, বর্ত্তমানের বাস্তব দুই লইয়াই ভবিষ্যতের ভারতের পত্তন করিতে হইবে।